মিলন রাগিণী

বিমল মিত্র

সৌখিন প্রকাশনী
২৪-এ, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৭১

প্রকাশক :—
প্রশান্ত তালুকদার
২৪-এ, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫

মুদ্রক :—
শ্রীফণীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
অবলা প্রিণ্টার্স
২৫।৩, তারক চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ শিল্পী
অরুণ বণিক

মিলন রাগিণী

॥ এক ॥

রোগীর মাথার কাছে মিট্ মিট্ করে তখনো প্রদীপ জ্বলছিল। ছোট ঘর। সে ঘরের মধ্যেও সে আলো তেমনি ঢুকতে পারেনি, কোনে কোনে অনেকখানি অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। রোগী নীরবে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে—জেগে কি ঘুমিয়ে আছে কে জানে। রোগীর পাশে একখানা হাত পাখা হাতে বসে আছে মঞ্জু। জমাট বাঁধা ঐ অন্ধকারের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে সে রোগীর মাথায় বাতাস করছিল।

কোনের জমাট বাধা অন্ধকার যেন চাচ্ছিল কখন প্রদীপটা নিবে যাবে আর সেই মুহূর্তে এ ঘর আচ্ছন্ন করে ফেলবে। মঞ্জুর মনে ভবিষ্যত তেমনি অন্ধকাররূপে জেগেছিল, কখন আশার ক্ষীণ আলো-টুকু নিবে যাবে আর সে তাকে নিবিড় ভাবে ঘিরে ফেলবে।

ছোট ঘরের বাইরে ভীষণ অন্ধকার। গলিতে মাঝে মাঝে পোস্টে এক একটি আলো। সে আলো-অন্ধকার অন্ধকারের ভীষণতা বাড়িয়ে তুলেছে। একে কৃষ্ণপক্ষ রাত, তার ওপর আকাশে নিবিড় কালো মেঘ। মাঝে মাঝে সেই কালো আকাশের বুক চিরে বিদ্যুত ছুটে যাচ্ছে। জানলার ফাঁক দিয়ে সে আলো ঘরের মেঝেয় এসে পড়ছে তার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘ গর্জন—রুদ্র গর্জ্জনে ঘর কেঁপে উঠছিল। এ রাত্রির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের আলো ধরনীর গায়ে ছড়িয়ে পড়বে, অন্ধকার কাটবে কিন্তু মঞ্জুর অন্তরের এ অন্ধকার কাটবে কি!

একবার কড় কড় করে ভীষণ শব্দে মেঘ ঠিক ঘরের ওপর ডেকে উঠল। অদূরে পৃথক শয্যায় শায়িতা নিদ্রিতা কন্যা চামেলীর ঘুম ভেঙ্গে গেল ধড়ফড় করে সে বিছানায় উঠে বসল। অতি কষ্টে ডাকল—মা—

—কি মা এই যে আমি। তাড়াতাড়ি পাখা ফেলে মঞ্জু মেয়ের কাছে সরে গেল, বললে—ঘুমো মা। খুব মেঘ ডেকে উঠেছে, তাই ভয় হয়েছে না?

মায়ের স্পর্শে সাহস পেয়ে চামেলী বললে—হ্যাঁ মা, বড্ড ভয় হয়েছিল। বাবার ঘুম ভাঙেনি তো?

মা বললে—কি জানি বুঝতে পারছিনে। দেখি। তুই শুয়ে পড় চামেলী, ঘুমো।

মেয়েকে শুইয়ে প্রদীপটা বাড়িয়ে দিয়ে মঞ্জু আবার স্বামীর কাছে এলো।

মেঘ গর্জ্জনের শব্দে কানাইয়ের সেই মুহূর্তে ঘুমের ভাব চলে গেল। স্ত্রী নত হয়ে স্বামীর বুকের ওপর ঝুঁকে দেখলো স্বামী চোখ চেয়ে আছে। মৃদু কণ্ঠে মঞ্জু জিজ্ঞাসা করল—তোমার ঘুম ভেঙে গেছে?

কম্পিত হাতে স্ত্রীর হাতখানা বুকের ওপর চেপে ধরে কানাই ক্ষীণকণ্ঠে বললে—ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রা এসেছিল, মেঘের ডাকে সে তন্দ্রাটুকু ভেঙে গেল মঞ্জু।

মঞ্জু জিজ্ঞাসা করলে—কি অতো ভাবছো?

পাণ্ডুর মুখে মলিন হাসির মৃদু রেখা ফুটল। কানাই একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—কি ভাবছি জিজ্ঞাসা করছো মঞ্জু? আমার কত ভাবনা—কতখানি ব্যথা আমার মনে তা কি তুমি বুঝতে পারছো না? এ রোগ আমায় যত কষ্ট না দিক, ভাবনায় তার চেয়ে বেশী যাতনা পাচ্ছি, মঞ্জু।

ব্যগ্রকণ্ঠে মঞ্জু বললে—তুমি কেন অত ভাবছো বলো তো? এইসব বাইরের ভাবনা ভেবে ভেবেই তোমার রোগ কমের দিকে আসছে না। আরও বেড়ে উঠছে। কিসের এত ভাবনা তোমার? কেন ভাবছো? তুমি ভালো হয়ে ওঠো, আবার সুদিন আসবে।

—আর ভালো হয়েছি মঞ্জু।

স্ত্রীর মুখের উপর দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কানাই বললে—সে আশা আর নেই, আশা থাকলেও আমি বাঁচতে চাইনে। আজ ছ'মাস বিছানায় পড়ে আছি। এই ছ'মাস অক্লান্ত ভাবে তুমি আমার সেবা করছো।

কি করে জানবে মঞ্জু তোমার এই সেবা নিতে আমি কতখানি লজ্জিত কতখানি কুণ্ঠিত হচ্ছি? আমি তোমার স্বামী শুধু পরিচয় দেবার বেলায় —কোনোদিন স্বামীর যোগ্য আচরণ করেছি স্বামীর কাছে স্ত্রী কতখানি পাবার প্রত্যাশা করে। তুমি তার কতটুকু আমার কাছে পেয়েছো? মঞ্জু? কানাই একটা নিশ্বাস ফেলল; পরে আবার বললে—একদিন পেয়েছিলে কিন্তু সে কতটুকুর জন্যে? আজ এই রোগ শয্যায় শুয়ে জ্ঞান হচ্ছে কিন্তু আগে কেন হলো না অন্ততঃ দু'দিনের জন্যও?

—এখন ভাবছি—কোথায় ছিলাম—কোথায় এসেছি কিন্তু সে কথা ভাবতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি মঞ্জু। একদিন আমার কি না ছিল? মানুষের যা কিছু প্রার্থনার, বিদ্যা-বুদ্ধি স্বাস্থ্য সব পেয়েছিলাম।

—আমার নিজের হাতে সে সব বিসর্জন দিয়েছি। আজ কোথায় সে সব বন্ধু, হাত ধরে যারা আমায় বিপথে নিয়ে যাচ্ছিলো? ইহ জীবনে আমার কাছ ছাড়া হবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল।

রোগ শয্যার পাশে আজ কেউ নেই মঞ্জু। যারা সুখের সাথী দুঃখের দিনে তারা সরে পড়েছে। তখন এই শয্যার পাশে কুড়িয়ে

পেলাম তোমায়। চির অনাদৃতা তুমি এখনও আমারই প্রত্যাশায় বসে আছ। কত অত্যাচার না করেছি। আজ সেইসব কথা মনে পড়ছে! তোমার এই ভালোবাসা ভরা সেবা নিতে তাই আমি কুণ্ঠিত হয়ে উঠছি। আমার অত্যাচারের চিহ্ন আজও তোমার গা থেকে মেলায় নি তবু সে সব ঢেকে এই অত্যাচারীর সেবায় ভাবে আত্মনিয়োগ করেচো!

হতভাগ্য স্বামীর কোটর প্রবিষ্ঠ দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আরও কথা বলবার ছিল বলা হলো না।

মঞ্জু স্বামীর চোখে জল দেখে অধীর হয়ে উঠল।

আঁচলে স্বামীর মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে রুদ্ধ কণ্ঠে বললে—ওগো—না না, সে অত্যাচার তো তুমি করোনি। তোমার ঘাড়ে ভূত চেপেছিল সে আমায় কষ্ট দিয়েছে, সেই তোমায় আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল! সে ভূত ছেড়ে গেছে, এবার আর আমি তোমায় হারাবো না। তুমি ভালো হয়ে ওঠো এখন রোগ শয্যার পাশে বসে তোমার সেবা করছি, এখন ভালো করে তোমার সেবা করবো।

হতাশ ভাবে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে কানাই বললে—সেদিন আর তোমার জীবনে পাবে না মঞ্জু. আমার বাঁচাবার ক্ষমতা আজ আর কারও নেই। তুমি আমায় বাঁচবার চেষ্টা করলে কি হবে, আয়ু আমি নিজেই নিঃশেষ করে ফেলেছি। কিন্তু একটা বড় ব্যথা বয়ে নিয়ে যেতে হবে মঞ্জু—

—ওগো, থাক্, থাক্, সে কথা আর তুলো না, তোমার পায়ে পড়ি—

ব্যগ্রভাবে স্বামীর মুখের ওপর হাতখানা চাপা দিয়ে মঞ্জু চামেলীর দিকে তাকাল।

সে তখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

হাতটা সরিয়ে দিয়ে কানাই বললে—না, আমায় বলতে দাও মঞ্জু আমার মন কতক হালকা হবে। কত দিন বলতে গিয়েছি তুমি এমনি করে আমার মুখে হাত চাপা দিয়েছো। আমার বুকের ব্যথা ছাপিয়ে উঠতে চায় মঞ্জু বাঁধন সে আর মানবে না, একবার প্রাণ ভরে চীৎকার করে এ কথা বলে আমায় কাঁদতে দিতে হবে। হয়তো চামেলী ঘুমিয়েছে ?

—হ্যাঁ।

স্ত্রীর হাত সাধ্যমত দুই হাতে চেপে ধরে আর্ত কণ্ঠে কানাই বললে—ঘুমোক্, ঘুমোতে দাও। উঃ অভাগিনী মেয়ে জানে না—বাপ হয়ে আমি তার কি সর্বনাশ করেছি। তাকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। সে যে কিছু জানে না মঞ্জু। আজকে জানতে পারেনি নেশার খেয়ালে, তার বাপ কারও কথা না শুনে শৈশবেই তার বিয়ে দিয়েছিল—বিয়ের পর একটি বছর না যেতেই সে হয়ে গেছে বিধবা।

—ওগো তোমার পায়ে পড়ি ওসব কথা মুখে এনো না। চুপ করো। ও যদি জেগে উঠে সব জানতে পারতো। তোমাকে সে দেবতার মত ভক্তি করে সে ভক্তি তার অটুট রাখতে দাও!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কানাই বললে—না আর বলবো না—কিন্তু কি চমৎকার। একমাত্র সন্তানের ওপর এত অবিচার করেও আমি তার কাছ থেকে অবাধে দেবতার ভক্তি গ্রহণ করছি। তবু তবু আমি সে সব কথা প্রকাশ করতে চাইনে, সে কথা আমার মনেই চাপা থাক। কিন্তু একটা কথা—তার মুখ অস্বাভাবিক দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

স্বামীর সেই দীপ্ত মুখ দেখে ও অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনে মঞ্জু ভয় পেল।

বললে—কি ? কি বলবে তুমি, বলো।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কানাই বললে—তাকে জানতে দিয়ো না, আর আর যদি সেরকম ছেলে পাও, জেনে শুনে যদি সে গ্রহণ করতে চায়—কোনো দিকে চেয়ো না মঞ্জু কারও কথা শুনো না, চামেলীকে তার হাতে সমর্পণ করো। এ শুধু আমার অনুরোধ নয়, এ আমার আদেশ বলে জেনো। আমি নিজের হাতে তার সর্ব্বনাশ করেছি। মরে যেন শান্তি পাই।

কানাই আর কথা বলতে পারল না ঘন ঘন হাঁপাতে লাগল।

রুদ্ধকণ্ঠে মঞ্জু বললে—তুমি চুপ করো। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, অমন অস্থির হয়ো না, ওতে তোমার জীবনের অনিষ্ট হবে।

—আর জীবনের অনিষ্ট! বড় মলিন হাসি কানাইয়ের মুখে ভেসে উঠল এখনও আশা করো আমি বাঁচবো? ভুল ভুল মঞ্জু; আমি আর বাঁচবো না। তুমি প্রতিজ্ঞা করো, আমি বেঁচে থাকতেই—আমার এই হাতের ওপর হাত রেখে তুমি বলো আমার আদেশ পালন করবে? নইলে আমি মরেও সুখী হবো না মঞ্জু। তোমাদের কাছে কাছে থাকবো। যেদিন জানবো আমার আদেশ তুমি পালন করেছো, আমার চামেলীকে সুখী করেছো—সেই দিনই আমি যথার্থ মুক্তি পাবো। বলো বলো মঞ্জু আমার কথা তুমি রাখবে?

নিঃশ্বাস টেনে মঞ্জু বললে - ওগো তুমি এ সব কি বলছো? আমি কেমন করে তোমার এ আদেশ পালন করবো?

কানাই বললে—কেমন করে? একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি মঞ্জু—তোমার সমাজ বড়? না স্বামী বড়?

মঞ্জু দুইহাতে মুখ ঢেকে রইল, উত্তর দিতে পারল না।

বলো মঞ্জু, আমার কথার উত্তর দাও আমি তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবো।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মঞ্জু বললে—ওগো, আমার সকলের উপর যে তুমি! আমার সমাজ ধর্ম্ম সকলের ওপর তোমার আসন, তাকি—

চোখের জলে তার বাকী কথা শেষ হলো না।

কানাই বললে—তবে আমার অনুরোধ আমার আদেশ শুনবে না মঞ্জু?

মঞ্জু ব্যাকুল কণ্ঠে বললে—রাখবো, তোমার আদেশ মেনে আমায় চলতেই হবে। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও। আর রাত জেগো না, ওতে আরও অসুখ বাড়বে।

আরামের নিঃশ্বাস ফেলে কানাই পাশ ফিরে শুলো।

॥ দুই ॥

কানাইয়ের প্রকৃতি বরাবরই জেদী। নিজের খেয়াল অনুসারে সে চলত। কারও মতামতের ধার ধারত না।

বাপ ও মা দুজনেই বর্তমান। কানাই তখন কোলকাতায় থেকে বি, এ পড়ে। মা বাবা বিয়ের উদ্যোগ করছিলেন, মেয়েও ঠিক, এমন সময় বাপ-মাকে গোপন করে কানাই এক অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করল। সেই মেয়ে এই মঞ্জু।

বিয়ের শেষে বউকে নিয়ে বাড়ি আসতে পিতা মাতা রেগে জ্বলে উঠলেন। ছেলে ছেলের বউকে স্থান দিলেন না। গ্রামে যাঁরা প্রতি-পত্তিশালী কুলীন বংশোদ্ভব বলে গণনীয় ও মাননীয় ছিলেন অপদার্থ আত্মজ্ঞানহীন পুত্রের জন্যে সমাজে ঘৃণ্য হতে পারবেন না একথা স্পষ্ট তাকে শুনিয়ে দিলেন।

দারুণ রাগে কানাইয়ের হৃদয় পূর্ণ হলো। সে গিয়ে গ্রামের সমাজপতি কুলীনের কুলপ্রদীপ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করল সমাজে তার স্থান হবে কিনা। মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাথা নাড়লেন। জানালেন অজ্ঞাত কুলশীলাকে বিয়ে করার জন্য হিন্দু সমাজে তার স্থান কিছুতেই হতে পারে না। সমাজে সে পতিত হয়েছে, যারা তার সংস্রবে আসবে তারাও জাতিচ্যুত হবে।

কানাই মাথা নত করে তাঁর কথা শুনে গেল। দারুন জিঘাংসায় তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তথাপি একটা কথা বলল না। সমাজপতি অবশেষে ধীর ভাবে জানালেন সমাজ কানাইকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে যদি সে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে একটা প্রায়শ্চিত্ত করে।

কানাই সমাজের অনুশাসন মেনে সুবোধ ছেলে হতে পারল না। সে স্ত্রীকে ত্যাগ করল না, প্রায়শ্চিত্তও করল না।

কানাইয়ের চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য অস্বাভাবিক প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। এই হিন্দুর সমাজ আর এই সমাজের আশ্রয়েই এরা বাস করে। কেবল মাত্র অজ্ঞাতকুলশীলা—এই অপরাধে সমাজ মঞ্জুকে গ্রহণ করতে চায় না। সমাজ দেখল না মঞ্জুও মানুষ, তারও ধর্ম্ম শিক্ষা জ্ঞান সবই আছে, সে মানুষের সমাজ থেকে বাইরে নয়।

এই সমাজ এখানে একটা মূল থেকে কত শাখা জাতির উদ্ভব হয়েছে, কত অস্পৃশ্য জাতির সৃষ্টি হয়েছে।—যাদের বাতাস গায়ে লাগলে স্নান করতে হয়। এরা মানুষের হিসাবে মানুষকে দেখে কৈ? দেখে শুধু বাইরের আচরণ। এই সীমাবদ্ধ সমাজের মধ্যে থেকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষ—উন্নতি করতে পারবে?

কানাই মোটামুটি জানত মঞ্জু ব্রাহ্মণের মেয়ে। এর বেশী জানতে চায়নি চাইলেও জানতে পারত না। মঞ্জুর নিজের সম্বন্ধে জানার কিছু ছিল না। কেননা, ছেলেবেলায় সে মাকে হারিয়েছে বাবার কাছে মানুষ। সেই বয়স্থা মেয়েকে পাত্রস্থা করতে না পেরে বৃদ্ধ পিতা শেষ শয্যায় শুয়েও শান্তি পাচ্ছিলেন না। কানাই তাঁর এ প্রস্তাবে সানন্দে মত দিল। বৃদ্ধের অন্তিম সময়টুকু শান্তিময় করে তুলতে সে মঞ্জুকে বিয়ে করেছিল।

সমাজকে, দেশবাসীকে ধিক্কার দিয়ে কানাই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেইদিনই আবার কোলকাতায় ফিরল। স্ত্রীকে এক বছর বাসায় রেখে চাকরীর চেষ্টায় ঘুরতে লাগল। তারপর বহু চেষ্টার ফলে পুলিশে একটা চাকরী জোগার করল।

মঞ্জু বুঝেছিল তার স্বামীকে কতখানি কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কেবলমাত্র করুণা বশতঃ এক মৃত্যু শয্যাশায়ী বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিতে তাঁর মেয়েকে জীবনের সঙ্গী করে স্বামীকে পিতা মাতার স্নেহ

দেশবাসীর সহায়তা, অতুল ধনসম্পত্তি সব হারাতে হলো। একমাত্র মঞ্জুকে ত্যাগ করলেই তিনি আবার সব পেতে পারতেন। সমাজ তাঁকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তিনি মঞ্জুকে ত্যাগ করলেন না।

তার জন্যই স্বামীর আজ সব থাকতে কিছুই নেই। এ কথা মঞ্জুর মনে অহরহ জেগে থাকত। স্বামীর চরণ ধূলির যোগ্যতাও তার নেই, এমনি ছিল তার বিশ্বাস। স্বামী যা করতেন তা ন্যায় হোক অন্যায় হোক তার ওপর একটা কথা বলবার ক্ষমতা মঞ্জুর ছিল না! নিজের হীনতা ভেবে সে এমনি কুণ্ঠিত থাকত।

পুলিশের কাজে নিযুক্ত হবার পর থেকে কানাইয়ের চরিত্র কলুষিত হয়ে পড়ল। শিক্ষিত হয়েও সে প্রলোভন এড়াতে পারল না। কথায় আছে পাপের পথ বড় পিছল, তাতে একবার পা দিলে নীচে এগিয়ে যেতে দেরী হয় না। কানাইয়ের তাই ঘটল। একবার পিছল পথে পা দিয়ে অত্যন্ত দ্রুতবেগে সে রসাতলের দিকে গড়িয়ে চলল।

এ সময়ে মঞ্জুকে উৎপীড়ন বড় কম সইতে হতো না। স্বামীকে বুঝতে গিয়ে অনেক সময় প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু সে ব্যথা কোনদিন তার মনে আঘাত দিতে পারেনি।

স্বামীর অধঃপতনের মূল যে সেই, এই কথাই তাকে ভীষণ বেদনা দিত। স্বামীকে সৎপথে ফেরাবার কোনো উপায় সে খুঁজে পেত না। অনেক সময় মনে হতো কানাইয়ের পিতা মাতা যদি এ সময় এখানে থাকতেন তা হলে হয়তো তিনি এমন উচ্ছৃঙ্খলতার পথে নামতে পারতেন না।

স্বামীকে লুকিয়ে সে শাশুড়ীকে ক'খানা চিঠি লিখেছিল। যেন সে ছেলেকে নিয়ে যায়, মঞ্জুর অদৃষ্টে যা আছে তাই ঘটবে। কিন্তু শাশুড়ী বা শ্বশুর কেউ সে চিঠির উত্তর দেয়নি।

একটি মাত্র মেয়ে চামেলী তার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কানাইকে বড় বেশী ভাবতে দেখা যায় নি। তবে মেয়ে ছেলে নয়; দু'দিন বাদেই তার বিয়ে হয়ে যাবে তখন পিতামাতার ভালমন্দের সঙ্গে তার ভবিষ্যতের ভালো মন্দ জড়িত থাকবে না।

সব কাজই সে জেদের বশেই করে যেত। একদিন সপ্তম বর্ষীয়া মেয়ে চামেলীর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে যখন সে বাড়ি ফিরল, তখন মঞ্জু প্রাণপণে চেষ্টায় এ প্রস্তাবে বাধা দিল।

আর্তকণ্ঠে স্বামীর পা দুখানা জড়িয়ে ধরে বললে, অমন সর্বনেশে কাজ করো না। মোটে এই পাঁচ বছরের মেয়ে এখন বিয়ে দেবার কি এত তাড়া পড়েছে? এখনও যে কাপড়খানা কি করে পড়তে হয় তাও জানে না, বিয়ের কি বুঝবে? কত মেয়ের বড় হয়ে বিয়ে হচ্ছে ওকে এই বয়েসে বিয়ে দেবার কি দরকার? তোমার পায়ে পড়ি, অমন কাজ করো না। চামেলীর ভবিষ্যত একটু ভেবে দেখো।

কানাই পা ছাড়িয়ে নিল, স্ত্রীর চোখের জলে, অনুনয়ে তার মন টলল না। অত্যাধিক মদ খাওয়ার জন্য অনেকেই তাকে ভবিষ্যত সম্বন্ধে সতর্ক হতে উপদেশ দিত। কিন্তু একেবারে সে উদাসীন ছিল।

স্ত্রীর জন্যও ভাববার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না তার। তবে মেয়ের জন্য যে ভাবনা একেবারে ছিল না, এমন কথা বলতে পারি না। সেই জন্যই সে তাড়াতাড়ি চামেলীর বিয়ে দিয়ে কন্যার ভবিষ্যত দায় থেকে মুক্তি চাইছিল।

যার বিয়ে সে কিছুই জানল না। পুতুল খেলার মত বিয়ে হয়ে গেল। পাঁচ বছরের মেয়ে খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে সিঁথিতে সিন্দুর পরলো।

কিন্তু হায়রে, সে কয় দিন; বিয়ের পর ছ'টি মাসও কাটল না।

এগারো বছরের জামাই একদিন চামেলীর নাম বাঙলার বিধবা তালিকাভুক্ত করে অনন্তের পথে যাত্রা করল।

আকস্মিক এই ঘটনায় মঞ্জু তো ভেঙে পড়লই কানাইও কম আঘাত পেল না। অনেক আশা করে মাতাপিতাহীন আত্মীয় পালিত ছেলেটিকে ঘর জামাইরূপে গ্রহন করেছিল। ইচ্ছা ছিল, তাকে সুশিক্ষিত করবে, যাতে সে যথার্থ মানুষ হতে পারে—চামেলীকে সুখী করতে পারে সে চেষ্টা করবে কিন্তু তার সে আশা পূর্ণ হলো না।

মদের মাত্রা কমেছিল আবার তা অত্যন্ত বেড়ে উঠল। আর কোনদিকে লক্ষ্য রইল না, উদাসীনের ন্যায় অনির্দিষ্ট পথে কানাই জীবন তরী ভাসিয়ে চলল।

এরপর চামেলী একটু বড় হতেই তাকে স্কুলে দেওয়া হলো। সে উৎসাহের সঙ্গে লেখাপড়া শিখতে লাগল। পাঁচ বছরের কটা কথা কয়েকদিন মাত্র মনে উজ্জ্বলভাবে জেগেছিল, ক্রমেই মলিন থেকে মলিনতর হয়ে অবশেষে একেবারে নিবে গেল।

সে যে বিধবা—এ জ্ঞান তার ছিল না। পিতা মাতাও প্রাণ থেকে তাকে সে কথা বলতে পারেনি। তবে চামেলীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে এক বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে অতি গোপনে কানাই প্রতি মাসের বেতন থেকে কিছু কিছু দিয়ে রাখত, সুতরাং মেয়ের সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন ছিল তা মনে হয় না।

পিতামাতার ওপর অত্যন্ত রাগ করেই সে খোঁজ-খবর নিত না। মাঝে মাঝে কেবলমাত্র কর্তব্য মনে করে কিছু টাকা পাঠাত কিন্তু ঠিকানা দিত না।

অত্যন্ত মদ খাওয়ার ফল আছেই। কাজেই কয়েক বছরের মধ্যে কানাইয়ের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। অবশেষে নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে সে একেবারে শয্যাশায়ী হলো।

এই সময়েই সে স্ত্রীকে যথার্থ চিনতে পারল। যাকে চিরদিন

অবহেলা করে এসেছে, চিরদিন যাকে পীড়ন করে এসেছে আজ এই দুর্দ্দিনে সে এসে মূর্ত্তিমতী করুণারূপে পাশে বসল। চামেলীও পড়াশুনা সাঙ্গ করে দিনরাত পিতার কাছে রইল।

অনেক চিকিৎসা সত্বেও রোগ আরোগ্যের পথে গেল না—অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়ে আসতে লাগল।

ডাক্তার যেদিন মুখ বিকৃত করে গেলেন সেদিন মঞ্জু আর স্থির থাকতে পারল না। স্বামীকে গোপন করে শ্বশুরকে একখানি টেলিগ্রাম করে দিল। এসময়ে তিনি যে স্থির থাকতে পারবেন না, তাঁকে আসতেই হবে—এ বিশ্বাস মঞ্জুর হৃদয়ে সুদৃঢ় ছিল।

॥ তিন ॥

দিন দিন কানাইয়ের অবস্থা খারাপ হতে লাগল। শেষে ডাক্তার একদিন সত্যিই জবাব দিয়ে গেলেন।

—বাবা—বাবা!

পিতার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে অশ্রু জড়িত কণ্ঠে চামেলী পিতাকে ডাকতে লাগল।

পিতা চোখ মেলল একটু, হাসির রেখা তার মৃত্যু মলিন কাতর মুখের ওপর ভেসে উঠল। কম্পিত হাতে বুকের ওপর মেয়ের মুখ চেপে ধরল। বুকের অব্যক্ত ব্যথা, কিছুটা যেন মিলিয়ে জুড়িয়ে গেল।

ক্ষীণ কণ্ঠে কানাই বললে—কেন ডাকবো মা?

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের সঙ্গে চামেলী বললে—তুমি আমাদের ফেলে কোথায় যাচ্ছ বাবা?

পিতার দুই চোখে জল উপচি'য়ে উঠল। এ কথায় সে জবাব দিতে পারল না।

ভোরের আলো তখন সবেমাত্র ধরণীর গায়ে নেমে আসছে। বাতাসে পাখীর গান তখনও জাগেনি। কানাইয়ের প্রাণ দেহ পিঞ্জর ছেড়ে এমনি সময়ে এক অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করল।

মঞ্জু নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্বামীর পাশে বসে রইল—পিতার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে চামেলী কাঁদতে লাগল।

* * *

পাড়ার সদাশয় প্রতিবেশীদের সাহায্যে শবদাহ হয়ে গেল। মঞ্জুকে সেজন্যে ব্যাকুল হতে হলো না।

তারপর কয়দিন মঞ্জু মূহ্যমান হয়ে রইল।

এ কয়দিন ভবিষ্যতের ভাবনা তার মনে জাগেনি। শোকের অসহ্য রেশ কমলে, আরো কঠিন সত্য দেখা দিল—মেয়েকে নিয়ে এখন কোথায় যাবে? মাসিক তিনশ টাকা ভাড়া দিয়ে বাসা রাখবে সে সামর্থ মঞ্জুর নেই। খোলার ঘরে থাকা চলে না—অভিভাবকহীন এই যৌবনোমুখী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে।

শ্বশুরকে টেলিগ্রাম করেছিল কিন্তু কৈ? চার পাঁচদিন কেটে গেল কেউ এলো না। উত্তর মিলল না।

বুকটাকে দলিত, মথিত করে এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস বয়ে গেল। হা ভগবান! তাকে বিয়ে করে স্বামীকে কত নির্য্যাতনই না সহ্য করতে হয়েছে! লোকে কথায় বলে কু পুত্র যদি হয় কু মাতা কখনো নয়। স্বামী কু পুত্রের আচরণ করেছিলেন কিনা সে জানে না: হয়তো করেছিলেন। কিন্তু জননীর স্নেহ তাতে শুকিয়ে গেল এটাও কি সম্ভব?

মায়ের গলা দুই হাতে জড়িয়ে অশ্রুমুখী চামেলী রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল। আমরা এখন কোথায় যাবো মা? এ বাড়ির ভাড়া তো আমরা আর দিতে পারবো না। তবে কোথায় থাকবো?

অতি কষ্টে চোখের জল সামলিয়ে জড়িত কণ্ঠে মঞ্জু বললে—ভগবানকে ডাকো চামেলী তিনি একটা না একটা উপায় করে দেবেনই! অনাথের সখা তিনি। পথও তিনি দেখাবেন! আর কেউ পারবে না।

পথের দিকে ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে এই দুটি নারীর দিন কি ভাবে কাটছিল, সহজেই তা অনুমান করা যেতে পারে। পাশের বাড়ির যে বিপত্নীক ডাক্তারটি কানাইয়ের চিকিৎসা করতেন চামেলীর প্রতি তার অন্য রকম দৃষ্টি লক্ষ্য করে মঞ্জু তাঁকে আর ডাকেনি। কোলকাতার মত স্থানে পাশের বাড়ির খবর কেউ রাখে না। মঞ্জু

কাকেও চিনত না। স্বামীর চিকিৎসা সূত্রে এই ডাক্তারটিকেই কেবল চিনত।

স্বামীর মৃত্যুর পর এই ডাক্তার যখন অযাচিত ভাবে সাহায্য করতে এলেন তখন মঞ্জুর হৃদয় আশঙ্কায় পূর্ণ হয়ে উঠল। সে ধন্যবাদ দিয়ে ডাক্তারকে বিদায় দিল।

তাঁকে বের করে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। বড় আশঙ্কায় দিন কাটাতে লাগল। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জগতের ওপর সে বিশ্বাস হারিয়েছিল। নিজের জন্য এতটুকু আশঙ্কা ছিল না। যত আশঙ্কা এই চামেলীর জন্য।

কোলকাতায় থাকতে প্রাণ আর চায় না। এর মধ্যে পাড়ার কয়েকটি দুর্দ্দান্ত ছোকরা উপদ্রব আরম্ভ করেছে। মঞ্জুর সারাদিন দারুণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটে। রাতেও মেয়েটিকে বুকের কাছে টেনে সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারে না। দিনের বেলায় সে চামেলীর জন্য কাঁদতে পারে না। কিন্তু সারারাত কেঁদে উপধান সিক্ত করত।

টেলিগ্রাম করার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জু শ্বশুরকে একখানি চিঠিও দিয়েছিল। একয়দিনের মধ্যে সে চিঠি তিনি নিশ্চয় পেয়েছেন। এই নিরাশ্রয় পরিবারের কথা ভেবে কি তিনি আসবেন না!

হতাশ হয়ে মঞ্জু বলছিল মিছে আশা চামেলী। তিনি কখনও আসবেন না। ছেলেকে ক্ষমা করতে পারেননি, সে কেবল আমার জন্যে। তিনি না গিয়ে যদি আমি যেতুম রে, তবে তিনি তাঁর এদিক কার কর্ত্তব্য থেকে মুক্তি পেতেন। তোকে নিয়ে মা বাপের কাছে যেতেন তাঁকে তাঁরা ক্ষমা করতেন তোকেও বুকে টেনে নিতেন। হতভাগী আমি সেইজন্য মলুম না। বেঁচে রইলাম তিনি চলে গেলেন।

চামেলী রুদ্ধ কণ্ঠে মাকে আশ্বাস দিল আর দু'দিন অপেক্ষা করে দেখা যাক না। ঠাকুরদা এখনও নিজেরও কর্তব্য বুঝতে

পেরে না আসেন, এইসব জিনিসপত্র বিক্রি করে বাসার ভাড়া মিটিয়ে আমরা কোন পাড়াগাঁয়ে চলে যাবো। আচ্ছা মা, তোমার বাপের বাড়ি কোথায় ছিল, তা তো একদিনও বলোনি। যদি কোনোপাড়াগাঁয়ে হয়, তবে সেখানে গিয়ে থাকলেও তো বেশ চলে যাবে।

মঞ্জুর মুখে নিমেষের জন্য মৃদু হাসির রেখা ভেসে তখনই মিলিয়ে গেল। মঞ্জু বললে—পোড়াকপাল আমার, আমি কে তাই ঠিক জানিনে।

শুনেছি বর্দ্ধমানের কোন গাঁয়ে এক কালে আমার বাবা নাকি ভাল গৃহস্থই ছিলেন। কুক্ষণে কোলকাতায় দোকান করে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

তার ওপর রেশ খেলে বাড়ি ঘর সব নাকি বিক্রী হয়ে যায়, আমার মা অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা যান।

আমার বয়েস তখন খুব কম। পাঁচ ছ' বছর হবে। তখন বাবা আমায় নিয়ে একখানা খোলার ঘর ভাড়া করে থাকতেন। শেষ বয়েসে তিনি অন্ধ হন।

পেটের দায়ে সেই অন্ধের হাত ধরে আমাকেই দোরে দোরে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াতে হতো। আমার ভাবনায় অন্ধ বাপের শান্তি ছিল না। তোমার বাপ—মহাপ্রাণ দেবতা—আমায় গ্রহণ করে অন্ধকে চিরশান্তি দিয়েছিলেন। বাবা আমার তাই বড় আরামে মরতে পেরেছিলেন।

স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায় মঞ্জুর বুক পরিপূর্ণ মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় মঞ্জু অন্ধকারে বারান্দায় বসে নীরবে নিজেদের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবছিল। কানাইয়ের ব্যারামের আগে বাড়ীওয়ালা কয়বার টাকার তাগাদা করেছিলেন, তারপর কিছুদিন চুপ করে থেকে আজ সকালে এসে ভদ্রভাবে জানিয়ে গিয়েছেন, তাঁর যে পাঁচমাসের ভাড়া বাকী রয়েছে অনুগ্রহ করে সে তার অর্দ্ধেক ছেড়ে দিচ্ছেন, বাকী

অর্দ্ধেক দিয়ে—দিন দুই চারের মধ্যেই মঞ্জুকে বাড়ি ত্যাগ করতে হবে। অন্য ভাড়াটিয়া স্থির হয়ে গেছে এখন কেবল তাঁরা উঠলেই হয়।

মঞ্জু অকূল সাগরে ভাসছিল; একবার ভাবছে শ্বশুরবাড়ী যাবে, আবার এখন ভাবছে বর্দ্ধমানে গিয়ে বাপের বাড়ীর খোঁজ নিয়ে সেখানে থাকবে। কিন্তু এ দুটোর একটাও ঠিক করতে পারছিল না। অথচ উঠে যেতে হবে, এটা নিশ্চিত।

অন্তরের মধ্যে হাহাকার করতে লাগল। ভয়ে পাছে চামেলী ঘাবড়িয়ে যায়। সে ছেলেমানুষ অথচ তার কি দৃঢ়তা। কিন্তু তার এ দৃঢ়তা তো মঞ্জুর মুখ চেয়েই।

* * *

—মা, ঠাকুরদা এসেছেন, কোথায় গেলে তুমি?

অত আলোর মধ্যে থেকে বাইরে বের হয়ে অন্ধকার বারান্দায় এসে চামেলী থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, তবু সে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল, মা সেখানে আছে কিনা।

রুদ্ধ কণ্ঠে পরিষ্কার করে মঞ্জু বললে—কি বলছিলি চামেলী?

চামেলী ব্যগ্র কণ্ঠে উত্তর দিল, ঠাকুরদা এসেছেন। তোমাকে ডাকছেন। এসো।

বহুকাল আগে দেখা শ্বশুরের কথা মঞ্জুর মনে হঠাৎ জেগে উঠল। সেই রুক্ষ প্রকৃতি কর্কশ-ভাষী বৃদ্ধ পুত্র ও পুত্রবধূকে যে বারান্দায় পর্যন্ত উঠতে দেয়নি উঠোন থেকে বিদায় দিয়েছিল। সেই রুক্ষ কর্কশ কথাগুলো বুকের মধ্যে কেটে বসেছিল একদিন, আজ তাই নতুন বেশে জেগে উঠল।

মন বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, মঞ্জু আজ জোর করে সে ভাব মন থেকে দূর করে দিল। আজ জোর করে মনে করতে হবে—এ দুঃসময়ে ইনিই একমাত্র আশ্রয়।

অতীতের কথা ভুলে যেতে হবে। অতীত বিলীন হয়ে গেলেও সামনে যে ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে তাকে গ্রহণ করতেই হবে।

বৃদ্ধের সে রুক্ষ স্বভাব আজ পুত্র-শোকে বিগলিত হয়ে গেছে, আজ তাঁর হৃদয় কোমল হয়েছে। নইলে দুঃখিনীর বেদনামাখা চিঠি পেয়ে তিনি আসবেন কেন? আজ রাগ ভুলেছেন যার ওপর রাগ, সে ছেলে আজ আর নেই।

একটা নিশ্বাস ফেলে মঞ্জু জিজ্ঞাসা করলে—এসেছেন? কোথায় তিনি? বসিয়েছিস তো তাঁকে?

চামেলী বললে—হ্যাঁ সেজন্যে তোমায় কিছু বলতে হবে না মা। সে সবই আমি জানি। তুমি এখন তাঁর কাছে চলো।

মায়ের আগেই চামেলী চলে গেল। আজ সত্যিই তার হৃদয়ে আনন্দ ধরছে না। ঠাকুরদাদার চোখের জল মিলাতে পেরেছে।

এই কয়টি প্রাণীর চোখের জল একজনেরই বিরহে ঝড়ছে। তিনি চামেলীর স্নেহময় পিতা। মঞ্জুর দেবতা, স্বামী।

হরিদাসের একটিমাত্র ছেলে পুঞ্জীভূত স্নেহের একমাত্র আধার। আজ ঠাকুরদাকে পেয়ে চামেলীর মনে হলো আর ভয় নেই, ঠাকুরদা এসেছেন। যাঁর সঙ্গে মনান্তর ঘটেছিল তিনি চলে গিয়েছেন।

বিরক্তি সঙ্গে নিয়ে তিনি গিয়েছেন, পিতার হৃদয়ে দিয়ে গিয়েছেন ভালোবাসা ও স্নেহ। ঠাকুরদা যে তাদের একটা উপায় করবেনই, চামেলী এটা বেশ বুঝেছিল।

মনের আবেগে প্রথম দেখাতে সে কেঁদে ফেলেছিল তারপর ডাক্তারের কথা পাড়ার ছেলেদের অত্যাচারের কথা বলল। বৃদ্ধ হরিদাস স্তব্ধ ভাবে সব শুনে গেলেন। নাতনীর মাথায় স্নেহ ভরে

হাত বুলাতে বুলাতে বললেন—আর কোন ভয় নেই দিদি, আমি এসেছি। কানাই নেই আমি আছি। বড় দুঃখ রইলো—সে জেনে গেল আমরা রাগ করে আছি। অকৃতজ্ঞ সন্তান যদি আগে একটা খবরও দিতো....

নিঃশব্দে তিনি চোখ মুছলেন।

॥ চার ॥

মঞ্জু প্রথমে কিছুতেই শ্বশুরের সামনে যেতে পারল না। তারপর অল্পে অল্পে সঙ্কোচ কেটে গেল, তখন এসে হরিদাসকে প্রণাম করল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে হরিদাস সতরঞ্চির ওপর বসে তামাক খাচ্ছিলেন, চামেলী নিজের হাতে তাঁকে তামাক সেজে দিয়েছে।

তামাক টিকা তিনি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এটি তাঁর চিরন্তন প্রথা। কোথাও যেতে হলে আর কিছু ভুল হয় হোক, এ জিনিস কয়টি গুছিয়ে সঙ্গে নিতে কোনদিন ভুল হয়নি।

তামাক টানতে টানতে তিনি ভাবছিলেন, টাকার কথা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অর্থভক্ত লোক। আজকাল আর সকলের প্রতি, অর্থের প্রতি অনুরাগ তাঁর খুব বেড়েছে। এতটুকু জিনিসও তাঁর গায়ের রক্ত ছিল, কোনো জিনিসের অপব্যয় তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না।

ছেলের ওপর রাগ করে ছেলের বউ সহ তাকে তাড়িয়ে দিলেও ছেলের প্রেরিত টাকাকে ঘৃণা করতে পারেনি। টাকার প্রতি আসক্তি অত্যন্ত বেশী ছিল বলেই সেই পরিত্যক্ত ছেলের প্রেরিত টাকা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

আজ যে তিনি এসেছেন এর মূলে প্রধানতঃ ছিল অর্থানুরক্তি। তারপর ছিল নাতনীর প্রতি কর্তব্য। পুত্রবধূর ওপর তাঁর বিন্দুমাত্র কর্তব্য ছিল না বলেই তিনি মনে করেন। দায়ে পড়ে যেটুকু সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছে তা কেবল এই চামেলীর জন্য।

চামেলীকে প্রশ্ন করে তিনি জানতে চেয়েছিলেন তার পিতা কত করে বেতন পেত, উপরি কিছু পেত কিনা কত রেখে গিয়েছে, সব খবর একে একে নিলেন।

ঠাকুরদার এত প্রশ্নের মধ্যে শুধু কত করে বেতন পেত, সেই কথাটিই চামেলী জানত। উপরির কথা শুনে বিস্ময়ে, বিস্ফারিত চোখে সে বললে—বাবা তো কোনদিনই উপরি নেননি ঠাকুরদা। মাসে মাসে মাইনেই পেতেন। উপরি যদি তিনি নিতেন, তাহলে আমাদের এমন অবস্থা হবে কেন?

কথাটা শুনে হরিদাস কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। কেউ কি বিশ্বাস করতে পারে যে পুলিশে কাজ করে মানুষ উপরি নেয় না? যে এ কথা মেনে নেয় সে মূর্খ।

মঞ্জু অনেকক্ষণ বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উভয়ের কথা শুনছিল। তারপর এসে শ্বশুরের পায়ের ধুলো মাথায় নিল। আজ পরোলোকগত স্বামীর কথা ভেবে তার চোখের জল কিছুতেই বাধা মানল না। চোখ ছাপিয়ে ঝরঝর ধারে ঝরে পড়তে লাগল।

রুদ্ধকণ্ঠে হরিদাস বললেন কেঁদে কি করবে মা? এসব ভগবানের দান। নইলে তার বুড়ো বাবা আমি বেঁচে রইলাম, সে চলে যাবে কেন? কোথায় আমার শ্রাদ্ধের যোগাড় করবে সে, তা না, তার শ্রাদ্ধের ভাবনা আমায় ভাবতে হচ্ছে।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ঘোরালেন। সে সময়টুকুর জন্য তাঁর অন্তর থেকে অর্থচিন্তা যেন বিলুপ্ত হয়েছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর হরিদাস একটা হুঙ্কার ছাড়লেন —নারায়ণ সবই তোমার ইচ্ছা।

চোখ ফিরিয়ে পুত্রবধূর দিকে চেয়ে বললেন—সব কথাই তো চামেলীর মুখে শুনলাম মা। এ রকম ব্যাপারের পর আর আমি

তোমাদের এখানে রাখতে ইচ্ছা করিনে। বিশেষ করে চামেলীকে, আমি নিয়ে যেতে চাই; কারণ ও আমার নাতনী, কানাইয়ের মেয়ে, তার চিহ্ন। ওর জন্যে যদি তুমি ইচ্ছা করো তুমিও গিয়ে আমার ওখানে থাকতে পারো।

মঞ্জু শতমুখে মৃদু কণ্ঠে বলল—দয়া করে তাই নিয়ে চলুন বাবা, আমাদের আর এমন জায়গা কোথাও নেই, যেখানে গিয়ে একটা দিন থাকতে পারি। বাড়িওয়ালা তাগাদা দিয়ে গেছে দু'তিন দিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আমরা আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছিনে। আপনার দুর্ভাগিনী নাতনী পুত্রবধূকে আপনার পায়েই রাখতে হবে বাবা। আর কোথাও আমাদের স্থান নেই।

শ্বশুরের দুই পায়ের ওপর মুখ রেখে মঞ্জু চোখের জলে তা আর্দ্র করে দিল।

শশব্যস্তে পা সরিয়ে নিয়ে হরিদাস বললেন—ওকি মা, অমন করে কাঁদতে নেই। তুমি যার মেয়েই হওনা, সে বিচার আমি এখন করছিনে।

এখন তোমায় অসহায় আশ্রয়হীন মেয়ে বলেই দেখবো। মেয়ের প্রতি মায়ের—সন্তানের প্রতি বাপের যা কর্তব্য, এখন আমি তাই করবো, সমাজ নিয়ে কথা পরে হবে।

আমি তো আগেই বলেছি মা, আমি যখন এসে পড়েছি, তখন তোমাদের আর এতটুকু ভাবনা নেই। তোমাদের ব্যবস্থা আমিই করে দেবো। টেলিগ্রাম পেলাম—কিন্তু সে বড় দেরীতে। তখন আমি বাড়ি ছিলাম না। আজ সকালে বাড়ি ফিরে টেলিগ্রাম দেখেই চলে এসেছি। যদি বাড়িতে থাকতাম, সে হতভাগার সঙ্গে একবার দেখাটাও হতো।

পরলোকগত পুত্রের জন্য পিতার মনে কতখানি ক্ষোভ সঞ্চিত ছিল, তা এইরূপ সামান্য দুই এক কথায় প্রকাশ পাচ্ছিল। অর্থের

বাসনা দিয়েও এ ক্ষোভ দুঃখ ঢাকতে পারা যায় না। হরিদাস অনেক চেষ্টা করেও একবার না দেখতে পাওয়ার দুঃখ সম্বরণ করতে পারেন নি।

কলকের তামাক কখন পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি কলকেয় হাত দিয়ে আবার তামাক সাজবার উদ্যোগ করতেই চামেলী বলে উঠল—আমায় দিন ঠাকুরদা আমি সেজে দিচ্ছি।

স্নেহপূর্ণ চোখে নাতনীর দিকে তাকাতেই বৃদ্ধের দুই চোখ আবার অশ্রুতে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মা, কানাই বেশ কিছু রেখে যেতে পেরেছে কি?

মঞ্জু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল—কিছু না বাবা, রেখে যেতে পারেননি। ঘরের এই জিনিসপত্র যা পড়ে আছে, এছাড়া আর কিছু নেই, মাইনে যা পেয়েছিলেন সংসারের খরচ চালিয়ে বাকি সব মদ খেয়ে উড়িয়ে গেছেন, একটি পয়সাও সঞ্চয় করতে পারেননি।

ইদানিং বড্ড মাতাল হয়ে পড়েছিলেন, বারণ করলেও কথা শুনতেন না, নিজের জেদে চলতেন। যা দু'এক পয়সা ছিল, গায়ের গয়না ছিল সব বেচে যে ক'মাস তিনি বিছানায় পড়েছিলেন তাঁর চিকিৎসা পথ্যের ব্যবস্থা করেছি—

মঞ্জুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

চিন্তিত মুখে হরিদাস তামাক টানতে লাগলেন; মনের অপ্রসন্ন ভাবের ছায়া মুখের ওপর একটু জেগে উঠল। মঞ্জু সে মুখের দিকে চেয়ে আর কথা বলবার সাহস পেলে না।

চামেলীর কথা হরিদাস যেমন বিশ্বাস করতে পারেননি, মঞ্জুর কথাও তেমনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। এটাও কি সম্ভব যে, সে সমস্তই উড়িয়ে দিয়ে গেছে, স্ত্রী কন্যার ভবিষ্যত চিন্তা করে কিছু রেখে যায়নি। হ্যাঁ উচ্ছৃঙ্খল অনেকে হয় বটে, তবু তারা ভবিষ্যতের

ভাবনা একটু ভাবে বৈকি। চামেলী ছেলেমানুষ, মার মুখে যা শুনেছে তাই সত্য বলে জেনেছে এবং সরল বিশ্বাসে সে তা ব্যক্ত করেছে।

তাঁর এই পুত্রবধূটি যেমন তেমন মেয়ে নয়। তা তিনি বেশ বুঝতে পারলেন। সে নিশ্চয়ই কিছু টাকা লুকিয়ে রেখেছে, দায়ে পড়লে তখন বের করে দেবে। এখন বেশী নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। এরপর বাধ্য হয়ে মঞ্জুকে সবই বের করতে হবে, মেয়েছেলের হাতে টাকা বড় বেশীক্ষণ থাকতে পারে না।

হরিদাস মনের কথা গোপন করে রাখলেন, এখন যাতে কোন মতে তাঁর মনের সঙ্কল্প প্রকাশ হয়ে না পড়ে, সে বিষয়ে সতর্ক রইলেন।

পল্লীগ্রামে যাবার আনন্দে চামেলী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। পল্লীগ্রাম কি রকম সেখানে এমনই বাড়ী ঘর, লোকজন আছে কি না, এমনই লাইট জ্বলে কি না ট্রাম মোটর চলে কিনা, এইসব নানা-রকম প্রশ্নে সে মঞ্জুকে বিব্রত করে তুলল।

ম্লান হাসি হেসে মঞ্জু বললে—তোর পাড়াগাঁ দেখবার সখ এবার মিটবে চামেলী। দু'দিন থাকতে না থাকতে আবার কোলকাতায় আসতে চাইবি। সেখানে শুধু জঙ্গল। এখানে একটা বাড়ি ওখানে একটা বাড়ি, এত লোকজন তুই পাবি কোথায়?

সেখানকার কাঁচা পথে ট্রাম বাস মোটর দূরে থাক ঘোড়ার গাড়িও চলে না, গরুর গাড়ি চলে। পথে তুই ইলেকট্রিক লাইট পাবি কোথায়? চাঁদ যখন ওঠে তখন যা আলো দেখতে পাওয়া যায়, নইলে সবই অন্ধকার!

চামেলী কল্পনায় শুভ্র জোৎস্নাময় উজ্জ্বল শান্ত পল্লীগ্রামের ছবি মনে এঁকে বলে উঠল—কিন্তু মা চাঁদের আলো সেইখানেই সত্যি করে জানতে পারা যায় বুঝতে পারা যায়।

মাসে যে কটা জ্যোৎস্না রাত পাওয়া যায়। পল্লীগ্রাম কেন—সহরবাসীও যদি সহর ছেড়ে সেখানে বেড়াতে যায়—তার কাছেও তা সুন্দর মনে হবে।

দিনরাত জ্যোৎস্নার আলো পেলে সে আলোর মধ্যে সৌন্দর্য্য থাকে না। পনেরো দিন অন্ধকারের পর কটা দিন জ্যোৎস্না পাওয়া যায় বলেই জ্যোৎস্নার এত আদর।

সত্যি মা, আমার আর এ গণ্ডগোল ভালো লাগছে না। এখন শান্ত পল্লীতে যেতে পারলে মনে হয় আমি যেন বেঁচে যাই। একে এখানে দিনরাত গণ্ডগোল তার উপর লোকের কি রকম অত্যাচার বলো তো? একটা রাত যে তুমি শান্তিতে ঘুমোতে পারো না, একটা দিন যে তুমি শান্তিতে থাকতে পাওনা, তা কি আমি বুঝতে পারিনে?

মায়ের চোখে জল এসে জমেছিল। মা মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছল। গম্ভীর স্বরে বললে—কে জানে মা—যেখানে যাচ্ছি সেখানে এ পোড়া অদৃষ্ট আবার উৎপাত জুটাবে কিনা। ভগবান যে সব রকমেই আমায় মেরেছেন মা। নইলে কি আমি এতটুকু ভয় করতাম? আমার মুখ যে থাকতেও নেই। অথচ অনুভব করবার শক্তি বিলক্ষণ।

চামেলী মায়ের যাতনা ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

মা বললে—নে, এখন শুয়ে পড় চামেলী অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল বাবা যা ব্যবস্থা করেন তাই হবে। আগে বাড়ি ভাড়াটা মিটিয়ে দিতে পারলে আমি নিষ্কৃতি পাই। আমার অনেক ভাবনা চুকে যায়।

চামেলী মায়ের বুকের মধ্যে মাথা রেখে শুয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল।

তখনও ঘরে আলো জ্বলছিল, অন্ধকারে মঞ্জু ঘুমাতে পারে না তাই।

আলোর দীপ্তি চামেলীর মুখের ওপর এসে পড়েছিল। সেই চিন্তামূল সরল পবিত্র মুখখানির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে মঞ্জু আকুলকণ্ঠে বললে—ভগবান আমি কি করে সে কথা বলব?

॥ পাঁচ ॥

কোলকাতার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে মঞ্জু মেয়েকে নিয়ে শ্বশুড় বাড়ি যাত্রা করল।

কোলকাতার বাসার জিনিসপত্র সবই বিক্রী হয়ে গেল। দুই একখানা জিনিস রাখবার কথা মঞ্জু বলেছিল, কিন্তু হরিদাস বললেন, এ সবের আর দরকার কি মা? সেখানে যা আছে সবই তোমাদের। আমি আর কদিন? আজ বাদে কাল চোখ বুজলে, তোমাদের জিনিষপত্র তোমাদেরই থাকবে। অনর্থক আর এখন এগুলো রেখে কোনো লাভ নেই।

জিনিসপত্র বিক্রী করে বাড়ি ভাড়ার টাকা মিটিয়ে হরিদাসের হাতে যে কয়েক শত টাকা থেকে গেল বউকে সে টাকা ফেরত দেওয়া আর প্রয়োজন মনে হলো না। মঞ্জুও তা চাইল না, তার অর্থের কি প্রয়োজন? এখন এই দুঃসময়ে একটু আশ্রয় পেলেই সে বেঁচে যায়।

ট্রেন থেকে নেমে ষ্টেশনে পা দিতেই মঞ্জুর মনে বহুকাল আগেকার স্মৃতি জেগে উঠল।

নতুন বউ শ্বশুর বাড়ি আসছে। বুক ভরা আশা আনন্দ নিয়ে শ্বশুর বাড়ি আসছে সেখানে সকলের মনের মত আদর্শ বউ হতে পারবে কিনা তাই ছিল একমাত্র চিন্তা।

একবার ভয়। একবার আনন্দ। একবার আশা। সঙ্গে সঙ্গে নিরাশাও তার হৃদয়ে উদ্বেলিত করে তুলেছে।

কানাই স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে তার মনের ভাব বুঝে আশ্বাস

দিচ্ছিল ভয় কি মঞ্জু আমি এমন কোন অন্যায় কাজ করিনি যাতে তোমার এত ভয় হচ্ছে। বাবা মাকে না জানিয়ে গোপনে তোমায় বিয়ে করেছি এই অপরাধ ? এ অপরাধের মার্জনা আমি পাবো সে আশা আমার আছে।

সে আজ কতকালের কথা। তারপর দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটে গিয়েছে। যখন দিনগুলো কাটছিল, তখন তার দিকে দৃষ্টি পড়েনি। আজ সে দিন চলে গেছে। তাই সে অতীত দিনের দিকে তাকিয়ে মঞ্জু ভাবছিল। সে দিনগুলো জলের মতো কেটে গিয়েছে। যখন সে দিন এসেছিল তখন কিন্তু বাস্তবিক তা জলের মত কাটেনি।

ষ্টেশনে কয়খানা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তারই একটা ঠিক করে হরিদাস তাতে বউ ও নাতনীকে উঠিয়ে দিলেন মঞ্জুর বাক্সও তুলে দিলেন। গাড়ি চলতে লাগল হরিদাস গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে গেলেন।

কুড়ি বছর আগে এই পথেই একদিন মঞ্জু চলেছিল। আজ সে পথে চলতে মঞ্জু গাড়ির পিছনদিনকার চাকা সরিয়ে দেখছিল।

কুড়ি বছর আগে যে গাছগুলিকে এতটুকু দেখেছিল আজ তারা বড় হয়েছে। আকাশের গায়ে মাথা তুলে সগর্বে দাঁড়িয়েছে। বাজারের কাছে একটা আঁকা-বাঁকা নারকেল গাছ কুড়ি বছর আগেও এতটুকু ছিল। এমন নুইয়ে পড়েনি। ওই যে বড় অশ্বত্থ গাছ, সেদিন ছিল এতটুকু। চারদিকে ঘেরা ছিল, পাছে গরুতে খেয়ে যায়। আজ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে সে গাছ শতবাহু বিস্তার করে সুশীতল ছায়া দান করে পথিকদের তৃপ্ত করছে।

জগতে আজ সকলে বড় হয়েছে সকলেই মাথা উঁচু করেছে। অবনত হয়েছে কেবল সে। শুধু তারই যা কিছু সর্বনাশ ঘটে গেছে।

বাড়ির দরজায় গাড়ি থামতে আদেশ দিয়ে হরিদাস বললে—এই আমাদের বাড়ি দিদি। তোমার মাকে নিয়ে নেমে এসো।

বাড়িখানি বোধ হয় হরিদাসের চার পাঁচ পুরুষ আগেকার তৈয়ারী। প্রাচীনকালে নতুন অবস্থায় দেখতে মন্দ না থাকলেও এখন অবস্থা শোচনীয়। দেওয়ালে নোনা লেগে বালি চুণ খসে পড়েছে। বাড়ির মূর্তি একখানা কঙ্কালের মতো।

সামনে কোনকালে একসময় পাকা প্রাচীর ছিল, তার চিহ্ন এখন-ও দেখতে পাওয়া যায়। খানিকটা জায়গা ঘিরে লাউ কুমরো প্রভৃতি গাছ দেওয়া হয়েছে সেগুলো লতিয়ে ছাদের উপর উঠেছে। দু'একটা ফুলও ধরেছে তাতে।

চামেলী হাঁ করে খানিকক্ষণ সেই জীর্ণ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—এই বাড়ি আপনার ঠাকুরদা?

ঠাকুরদা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন—এই বাড়িই আমার চামেলী। এই বাড়িতেই তোমার বাপ জন্মেছে, এখানে খেলেছে, মানুষ হয়েছে। তার জীবনের আঠারো বছর কেটে গেছে এখানে। তখন সে এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে একদিনও থাকতে পারতো না। তখন এ-বাড়ির এমন জীর্ণ দশা হয়নি।

মানুষ না থাকলে ইন্দ্রপুরীরও এমনি দুরবস্থা হয়। আমি একা বুড়ো মানুষ-কোন দিকে যে দেখি, তার ঠিক পাইনে। তোমরা নেমে এসো আমি ততক্ষণ তোমার ঠাকুর মাকে খবর দিই। তিনি তো জানেন না তোমরা এসেছো।

গারোয়ানকে বাক্স প্রভৃতি আনবার আদেশ দিয়ে তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

অবসন্না জননীর হাত ধরে চামেলী বললে—নেমে এসো মা। তুমি যে উঠতে পারবে না।

একটা তীব্র নিশ্বাস ফেলে মঞ্জু বললে—চল মা। পা যে আমার আর উঠতে চাইছে না।

বাড়ির মধ্যে কান্না শোনা গেল। জানা গেল পুত্র শোকাতুরা জননী আছড়িয়ে পড়ছেন।

দরজার কাছে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। তার হাত ধরে একটি ছোট ছেলে। মেয়েটির বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ বছর হবে। পরণে সাদা থান অঙ্গে অলঙ্কার নেই। সে মা ও মেয়েকে অভ্যর্থনা করল। প্রশ্ন করে মঞ্জু জানল, সে গৃহিনীর ভ্রাতুষ্পুত্র বধু। ছেলেটি তারই একমাত্র ছেলে।

চামেলীর হাত ধরে সে ভেতরে চলে এলো মঞ্জুও তাদের পেছনে চলল। বারান্দায় একটা মাদুরে তাদের বসিয়ে মেয়েটি কার্য্যান্তরে গেল।

ঠাকুরমা খানিক কেঁদে আপনিই স্থির হলেন; নাতনী ও ছেলের বউকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করে দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তিনি তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেলেন।

দুই একদিন থাকতে থাকতে সকলের পরিচয় মিলল। শাশুড়ী সরমা দেবী অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন। সামান্য একটুতে সে অত্যন্ত রেগে উঠত, কিছুতেই তখন নিজেকে তিনি সামলাতে পারতেন না।

পুত্রবধূকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিলেন না। তাঁর অন্তরে কেবল বাজছিল এ তাঁকে বড় ফাঁকি দিয়েছে, তাঁর অন্তরের ধনকে তার কোলছাড়া করেছে। কিন্তু তাকেই বা রাখতে পারল কৈ?

রাক্ষসী কোথায় তাকে বিসর্জন দিয়ে এলো কে জানে। মনের মধ্যে তাঁর যে বিরাট অপূর্ণতা জেগেছিল, মঞ্জু এসে সে অপূর্ণতা আরও বাড়িয়ে তুলল।

চামেলীকে তিনি দূরে রাখতে পারেন না; কারণ তার মা যাই হোক তাঁর কানাইয়ের বড় আদরের মেয়ে। কানাইয়ের মুখের সাদৃশ্য চামেলীর মুখে। তেমনই তার সরল মন তেমনি মিষ্টি কথা।

তথাপি সে চামেলীকে একেবারে কাছে টেনে নিতে পারলেন না।

তার মা কার মেয়ে ঠিক নেই—এই কথাটা মনে জাগছিল অহরহ। তিনি মা ও মেয়েকে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করতে দিলেন না, রান্না ঘরে ঢোকবার অধিকারও দিলেন না। কেননা এই দুটি ঘরেই তাঁর জাতি ধর্ম বিদ্যমান আছে। চামেলীকে তিনি ভাল বাসতে পারেন তার জন্য, তাই বলে জাতি ধর্ম বিসর্জন দিতে পারেন না।

মঞ্জু সরমে মরে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে রইল। যতখানি দূরে তাকে রাখা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী দূরে সে নিজেই সরে রইল। সে কেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে? এ বাড়ির একটা ক্ষুদ্র জিনিষেও তার হাত দেবার অধিকার নেই।

ঘাটের পথে সরলা দেবীর সঙ্গে মা ও মেয়েকে দেখে গ্রামের মেয়েরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। সরমা দেবী সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন তা উনি তো মানুষ বটে।

কানাইয়ের অসুখ শুনে গিয়ে দেখেন সব শেষ হয়ে গেছে, বাড়ি-ওয়ালা ভাড়ার জন্যে এদের যা-না তাই বলছে। যাই হোক কানাই যাই করুক—সে যখন এখন নেই, তখন স্নেহের খাতিরে তার কাজের জের এখন এঁকেই টানতে হবে। না বলবার জো নেই। তাই যখন এরা তাঁর পায়ে কেঁদে পড়লো, তখন বাধ্য হয়েই নিয়ে আসতে হলো।

গ্রামের মেয়েরা হরিদাসের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অনেকে বললেন—তা তো বটেই দিদি সে তো ঠিক কথাই। আহা কানাইয়ের যে এমন হবে তা কে ভেবেছিল? কিসেরই বা বয়েস। এই বয়েসে....

মা ও মেয়ের সম্বন্ধে গ্রামবাসী পুরুষ ও মহিলার মনের ভাব হরিদাস ও সরমার মনের ভাব স্পষ্ট জানতে পেরে মঞ্জু আরও কুণ্ঠিতা হয়ে পড়ল। না, এখানে না আসাই ভালো ছিল। এমন ঘৃণিত ভাবে সকলের লক্ষ্যের মধ্যে বাস করা যায় না, এ একেবারে অসহ্য! যদি সে না আসত।

কিন্তু থাকতই বা কোথায় ? কোলকাতায় কোথায় মেয়ে নিয়ে আশ্রয় পেত সে ? নিজে না হয় লোকের বাড়ি দাসীবৃত্তি করত।

কিন্তু চামেলী ?

সে দাসীবৃত্তি করতে পারত না যৌবনের অসীম রূপ নিয়ে। কে জানে চামেলীর অদৃষ্টে কি ঘটত, প্রলোভন সে এড়াতে পারত কিনা।

পল্লীগ্রামের লোকেরা বাইরের হুজুগে কান দেয় না, কিন্তু কার ঘরে কি হলো, কে কাকে কি বলল, তখন কে কি দিয়ে ভাত খেল সে সংবাদ ঠিক রাখে। এইটিই পল্লীবাসির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

সহরে পাশের বাড়িতে কি হলো, সে খবর কেউ জানতে পারত না, পল্লীগ্রামে, প্রান্তের গোপনীয় সংবাদ নিমেষে ও প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায় এবং অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পল্লীবাসী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অত্যন্ত মাথা ঘামায়।

মঞ্জু সকল অনুশাসন মাথা পেতে মেনে নিলেও চামেলী কিছুতে তা মানতে চাইছিল না। সে এক একবার সাপের মত গর্জে উঠছিল। মা তার মুখ চেয়ে রাখলেও স্পষ্টবাদিনী এই মেয়েটির জন্য তার বড় ভয় ছিল, কখন কোন্ কথা সে বলে বসবে ঠিক কি।

ছেলে চলে গেল। অত্যন্ত রাগ করেই গৃহিণী নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র রতনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিলেন। রতনের বিয়ে তাঁরাই দিয়েছিলেন। ছায়া রতনের স্ত্রী। ছেলে রমেশ জন্মানবার কিছুদিন পরে রতন ইহলোক ত্যাগ করে গেছে।

গৃহিণীর ইচ্ছা ছিল ছেলে যদি ফিরে আসে এবং অজ্ঞাতকুলশীলা বউকে বিয়ে করার ফলে অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্তান্তে কোনো সৎ ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করে সংসারী হয়, তা হলে তাঁর যা কিছু

সেই পাবে, রতনের বিধবা বৌ ও ছেলেকে সামান্য কিছু ধরে দেবেন।

মঞ্জু ও চামেলীকে গ্রহণ করতে প্রথম থেকে তিনি বিরূপ ছিলেন। ছেলের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে প্রথম শোকাবেগ কাটলে তিনি কর্তাকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেবার উদ্যোগ করছিলেন, কিন্তু হরিদাস যখন টাকাকড়ি বুঝিয়ে দিলেন, তখন তিনি আর কথা বলতে পারলেন না; মন্ত্রমুগ্ধ সাপের ন্যায় চুপ করে রইলেন।

এই দুই অভ্যাগতার ওপর ছায়ারও অল্প বিরক্তি ধরেনি। সে ঠিক জানত তার ছেলের জন্যই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যা কিছু সঞ্চয় রেখে যাচ্ছেন, এ দুজন কোথা থেকে ভাগ বসাতে এলো? সে স্পষ্ট চক্ষে দেখল, বৃদ্ধ তাঁর সব সম্পত্তি চামেলীকে দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর ছেলে রমেশ কপর্দ্দকহীন কাঙাল হয়ে পথে দাঁড়াচ্ছে।

নিঃসম্বল অবস্থায়ও সংসারে এসে চামেলী সঙ্গী পেল রমেশকে। ছেলেমানুষ সংসারের কুটিলতা এখনও তার অন্তরে স্পর্শ করেনি। চামেলীকে দেখে রমেশও তার এই দিদিটিকে বড় ভালবেসে ফেলল।

দিনের অধিকাংশ সময় সে চামেলীর কাছেই কাটিয়ে দেয়। চামেলীও এই ছেলেটিকে সঙ্গী পেয়ে কথা বলে বাঁচল। রমেশ না থাকলে সত্যিই সে বিপদে পড়ত।

গ্রামের মেয়েদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। কুড়ি বছর আগে মাত্র দুই তিন ঘণ্টার জন্য মঞ্জু এ গ্রামে এসেছিল। তখন তাকে দু'চারজন মাত্র দেখলেও বিয়ের কথাটা সকলে জেনেছিল। এই অদ্ভুত বিয়ের পাত্রীটিকে দেখার ইচ্ছা সকলের মনে জেগেছিল।

সে এসেছে শোনামাত্র দলে দলে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া যুবতী কিশোরী বালিকা এসে জুটতে লাগল। যেন সত্যিই তারা দেখার বস্তু। এদের বিস্ফারিত চোখও বিস্ময়পূর্ণ কথা শুনে চামেলী হাসবে কি রাগ করবে, ভেবে পেল না।

চামেলীকে এখনও কুমারী অবস্থায় দেখে লোকের চোখ কপালে উঠল, তারা বললে—ওমা এত বড় মেয়ে। বয়স কত হলো গা ?

মঞ্জু বললে—এই সতেরো বছর।

বিস্ময়ে গ্রামবাসীগণ অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। কারণ সতেরো বছরের কুমারী মেয়ে পল্লীগ্রামে পাওয়া দুষ্কর। বারো বছর পূর্ণ না হতে এখানে বিয়ে দেওয়া চাই, নইলে জাত যায়।

গ্রামের দিদিমা স্থির থাকতে না পেরে কোন মতে বলে ফেললেন—এত বড় মেয়ে সামনে রেখে দিব্যি ভাত গিলতে পারছো তো বাছা ?

মঞ্জু একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছিল, একটি কথাও তার মুখ ফুটে বার হয়নি। চামেলী পাছে মনে করে তার সারা জীবনটাই পিতা এমন ব্যর্থ করে ফেলেছেন। সামান্য খেয়ালের বশে একটা নারীর আশাপূর্ণ জীবনটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। এতকাল যে কথা সে বলতে পারেনি, আজ কেমন করে বলবে ?

হায় নারায়ণ! কেন এ সত্য গোপন করার প্রবৃত্তি তার মনে জেগেছিল ? যা ঘটেছে কেন সে তা প্রকাশ করতে পারেনি! এ কথা কি চিরদিন গোপন রাখতে পারা যাবে ? একদিন প্রকাশ হবেই। তখন চামেলীর অন্তরে কি ব্যথাই না বাজবে! তখন সে তার পিতা মাতাকে কতখানি অপরাধী ভেবে তাঁদের উপর কতখানি বিদ্রূপ করবে।

তবু সে বলতে গিয়ে বলতে পারল না। চামেলীর হাসি ভরা মুখ, হাতের চুড়ি, শাড়ির দিকে চেয়ে মঞ্জু নিঃশব্দে রইলো।

না!—যে কয়দিন এমনি যায়—যাক্। তখন প্রকাশ হলে সমাজের অত্যাচারের ফলে চামেলীর গা অলঙ্কারশূন্য করতে হবে।

সে কি কষ্ট!

না—না। মঞ্জু সে কথা প্রকাশ করতে পারবে না। যতদিন

গোপন থাকে থাক। তার পর যখন প্রকাশ হবে। চামেলী যখন প্রশ্ন করবে কেন আগে এ কথা জানাও নি? তখন—তখন সব দোষ সে মাথা পেতে নেবে।

মঞ্জু নীরব রইল দেখে, দিদিমা আর দু একটা কথা বলবার প্রলোভন এড়াতে পারলেন না; বললেন—তা বাছা কোলকাতায় যা তা চলে। দেশের মধ্যে থাকতে গেলে সমাজের আইন কানুন মেনে চলতে হয়। মেয়েকে তো আইবুড়ো রাখা চলে না। ছেলে হলেও না হয় হতো।

অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে মঞ্জু বললে—ওকে আর কে বিয়ে করবে বলুন? ওর মায়ের কথা শুনে কেউ কি ওকে বিয়ে করতে চাইবে! ভগবান ওর সুমতী দিন। চিরকুমারী থেকে দশজনের সেবা করেই ও দিন কাটাক। আপনারা ওকে সেই আশীর্ব্বাদই করুন।

দিদিমা একটু ভেবে বললেন—সে কথা সত্যি বটে। জেনে শুনে কোন্ বামুনের ছেলে তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে বাছা! তা হলেও আশা কি ছাড়তে আছে গা? বিয়ের ফুল ফুটলে পাত্র আপনি আসবে। মেয়ে তোমার সুন্দরী, অনেকের ঝোঁক হবে। আচ্ছা আমি চেষ্টা করবো বাছা। শ্বশুরকে বলে আমার ঘটক বিদায় দিয়ো।

তিনি বিদায় নিলেন। মঞ্জু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

॥ ছয় ॥

সরমা দেবী স্নানান্তে এক ঘড়া জল নিয়ে বাড়ি আসছিলেন। সেই সময় চামেলীও স্নান করবার জন্য ঘাটে যাচ্ছিল। বাতাসে পড়ে যাওয়া আঁচলটাকে আবার কাঁধের ওপর ফেলতে গিয়ে দৈবদুর্বিপাকে উড়ে সরমা দেবীর গায়ে ঠেকল।

পথ সরু। একজন মাত্র লোক সে পথে চলতে পারে। দু'জনে কোন ক্রমে পাশাপাশি চলতে পারা যায় মাত্র। পথের দু'ধারে শেয়াল-কাঁটা, ফণী মনসা প্রভৃতি কাঁটা গাছ। দাঁড়াবার জায়গা কোথাও ছিল না।

আঁচল গায়ে লাগতে সরমা দেবী থমকে দাঁড়ালেন। তিনি কোথায় স্নানান্তে পবিত্র মনে, পবিত্র দেহে, ঠাকুর পূজার জন্য জল নিয়ে যাচ্ছিলেন, শুচিতা বাঁচাতে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কলসী কাঁখে লাফ দিয়ে দিয়ে পথ পার হচ্ছেন, এমন সময় একি বিসদৃশ কাণ্ড!

কর্কশ কণ্ঠে তিনি গর্জে উঠলেন—হতভাগা ছুঁড়ি। বলি চোখ দুটোকে কোথায় রেখে পথ হাঁটছিলি লা? বিয়ে যদি যোগ্য বয়েসে হতো, এতদিন যে দু'ছেলের মা হতে পারতিস। এমনি করে পথ চলে! একটু লজ্জা হয় না লা! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ!

এই দারুণ ধিক্কারে চামেলীর কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। সেও রাগের বশে কি একটা কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল; নিজেকে সামলে নিয়ে নরম সুরে বললে—ইচ্ছা করে তো দিইনি ঠাকুমা বাতাসে আঁচলটা উড়ে গিয়ে তোমার গায়ে লাগল।

—না! ইচ্ছে করে দিসনি অমনি বাতাসে এলো আর তোর

আঁচলখানা উড়িয়ে এনে আমার গায়ে ফেললে। এসব তোর নষ্টামী-দুরন্ত পনা। আমায় জব্দ করতে চাস? সবেমাত্র এই চান করে এলাম, এখন আবার ফিরে গিয়ে চান করতে হবে। জল আনতে হবে—কি আমার—

যে কলসী তুলতে তিনি অনেক কষ্ট পেতেন, প্রবল রাগে সেই জলপূর্ণ কলসী দুই হাতে ধরে উপুড় করে জলটুকু ফেলে দিয়ে আবার ঘাটে চললেন।

এই বৃদ্ধার শুচিতার প্রাবল্য দেখে চামেলীর হাসি পাচ্ছিল। রাগের ভাব কেটে গিয়েছিল। এমন শুচিবাইগ্রস্তা নারী ঢের দেখতে পাওয়া যায়—যারা শুচিতা বাঁচাতে গিয়ে অনেকখানি সময় নষ্ট এবং শারীরিক ক্লেশও প্রচুর সহ্য করে। পল্লীগ্রামের পরিচয় চামেলী আজকাল পেয়েছে। কোলকাতায় থেকে জানত না।

সরমা দেবীর পেছনে চলতে চলতে চামেলী বললে—ঘড়াটা আমায় দাওনা ঠাকুরমা। আমি চান করে এক ঘড়া জল এনে দিচ্ছি।

বিরক্তি ভরা মুখে ঠাকুমা বললে—না বাছা, আমিই জল নিয়ে আসছি। তোমার আর অত উপকার করতে হবে না।

চামেলী হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বললে—তবেই আমি তোমার সতীন হতে পেরেছি ঠাকুমা। আমায় কিছু ছুঁতে দেবে না, আমার ছুঁয়ে আবার চান করতে চললে, এতে আমি তোমার সতীন হই কি করে? সতীন হলে আধাআধি বখরা—তা জানো তো?

সরমা দেবীর মুখের জমাট বাঁধা অন্ধকার মুহূর্তের জন্য যেন ঘুচে গেল, একটু হাসির রেখা তাঁর দন্ত বিহীন অধরে উথলিয়ে উঠল, তিনি আদরপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—আধাআধি কেন ভাই? সবটাই তোমায় দিচ্ছি।

চামেলী তেমনি গম্ভীরমুখে বললে—তাইতো, এটা শুধু তোমার

মুখের কথা ঠাকুরমা, মনের কথা নয়। তুমি রান্না ঘরে ঢুকতে দাও না, ঠাকুর ঘরে যেতে দাও না, একটা ঘড়া ছুঁলে সে জল ফেলে আবার জল আন। তুমি আবার সমস্তটা আমায় দেবে? আমি বাড়ী গিয়ে সব কথা ঠাকুরদাকে বলে দেবো যে, তুমি আমাদের কিছু ছুঁতে দাও না, ঘরে উঠতে দাও না।

সরমা দেবী হাসি মুখে বললেন—তা বলে দিস্, তোর ঠাকুরদা আমার একটা কান কেটে না হয় পথে বার করে দেবে।

ঘাটে পৌঁছে তিনি একটা ডুব দিয়ে এক কলসী জল নিয়ে উঠলেন—চামেলী অনুনয়ের স্বরে বললে—একটু দাঁড়াও ঠাকুরমা, আমি চট্ করে গোটাকতক ডুব দিয়ে নিই।

সরমা দেবী বিরক্ত হয়ে বললেন—জ্বালিয়ে খেলি বাপু! তাড়াতাড়ি নে। আমার এখনও পুজোর যোগাড় বাকী।

তাড়াতাড়ি স্নান করতে করতে চামেলী বললে—আমায় একদিন পুজোর যোগার করতে দেবে ঠাকুর মা। আমার বড় ইচ্ছে করে নিজের হাতে যোগাড় করে দিই। আজ তো ডুব দিয়ে যাচ্ছি। দেবে পুজোর যোগার করতে?

সরমা দেবী চুপ করে একটু সময় দাঁড়িয়ে রইলেন, অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন—তা করিস, আগে বিয়েটা হয়ে যাক—তারপর।

চামেলী বললে—কেন বিয়ে না হলে বুঝি পুজোর যোগাড় করতে নেই?

সরমা দেবী বললেন—সব তো জানিস চামেলী, তবে জেনে আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন?

ওপরে উঠে লম্বা লম্বা চুল মুছতে মুছতে চামেলী বললে—কেন জিজ্ঞেস করবো না ঠাকুর মা? এতদিন তো জিজ্ঞেস করিনি এই আশ্চর্য। আমি কি বুঝতে পারিনে আমার মায়ের গর্ভে জন্মেছি বলেই তুমি আমায় এত দূরে রেখেছো?

আমার মা তো পতিতা নয় ঠাকুর মা! আমার বাবা—তোমার ছেলে তাঁকে রীতিমত নারায়ণ সাক্ষী রেখেই বিয়ে করেছিলেন। তুমি আমায় ঠাকুরের পূজোর যোগাড় করতে দেবে না, শুধু আমার মায়ের জন্যে? তোমরা মনে করো আমার বাপ আমার মাকে ধর্ম্মসম্মত ভাবে বিয়ে করেননি? কি জঘন্য ধারনা। আমি এ সব শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। এই যে ঠাকুর পূজোর যোগাড়ের অধিকারটুকুও আমায় দিচ্ছো না, সত্যি বলো দেখি ঠাকুরমা, ঠাকুর কি তোমার একার? তোমারই কেবল তাঁকে পূজো করবার অধিকার? আমি তো বামুন ঠাকুরমা? মা না হয় তোমাদের রাগের কারণ হয়ে আছে —বাবা তো তোমারই ছেলে ছিলেন। এই মায়ের গর্ভে জন্মেছি বলে আমি সত্যিই এমন ঘৃণিতা, আমায় ছুঁয়ে পূজোর যোগাড় তুমি করতে পারবে না, আবার তোমায় স্নান করতে হবে? তোমার জাত এমন ঠুন্‌কো যে আমাদের ছোঁয়া লাগলে ভেঙ্গে যাবে? ভগবান সকলের। তোমার যেমন তাঁকে পূজা করবার অধিকার আছে, আমারও তেমনি অধিকার আছে; ছোট জাত হাড়ি বাগ্দীরও সে অধিকার আছে। বড্ড বাড়াবাড়ি করে তুলেছ তুমি। আমাদের এতটা তফাতে রাখলে ঠাকুর পূজোর কোন ফল হবে না। তুমি নর-নারায়ণকে ঘৃণা করে পাথরকে নারায়ণ বলে পূজা করছো।

—ওরে থাম্-থাম্। বক্তৃতা থামা বাপু। নরনারায়ণ পাথরের নারায়ণ—হায়রে কত কথাই না কালে কালে শুনতে হবে। তুই এতটুকু মেয়ে চামেলী তোর মুখে এসব কথা শুনে সত্যি গায়ে যেন বিষের জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তুই থামবি? নয়তো বল আমি চলে যাই।

তাঁর সঙ্গে চলতে চলতে চামেলী বললে—এই তো চলেছি ঠাকুমা; তুমি বরং পাঁচ হাত তফাতে চলো—তোমার যেমন শুচিতা দেখছি, তাতে আমার গায়ের বাতাস লাগলেই তুমি অপবিত্র হয়ে যাবে।

দরকার নেই বাপু কাউকে কষ্ট দিয়ে, আমরা যখন হাড়ি ডোমের অধম তখন আমাদের তেমনি ভাবে থাকাই ভাল।

একটু কুণ্ঠিতা হয়ে সরমা দেবী বললেন—না ভাই সত্যি কি আমি তাই বলি; তবে পুজোর জিনিষটা আর খাওয়ার জিনিষটা—কি জানিস ভাই, আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত। সংসারে থাকতে গেলে আচার বিচার মেনে চলতে হয়। কিছু মনে করিস নে ভাই। সমাজ এখনও তোদের নিতে চায় না, তফাৎ করে রেখেছি, তাই এখনও চলছি। নইলে কি ভাই কেউ ছুঁতো? না আমাদের বাড়ীতে আসতো? অমনি একঘরে করে রাখতো। বুড়ো বয়সে সত্যি ভয় করে—

অধীর উচ্ছ্বাসে চামেলী বলে উঠল—থাক্ হয়েছে' ঠাকুমা। তোমরা তোমাদের এই সমাজকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকো। যে সমাজ এই রকম বিচার, করে সে সমাজে কেউ ইচ্ছা করে বাস করতে চায়? আমি এমন সমাজে বাস করতে চাইনে ঠাকুমা। আমি এমনি দূরেই থাকবো, তোমাদের কাছেও যাব না।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবেই সে পথ চলতে লাগল।

॥ সাত ॥

—দিদি—

রমেশ পথের ধারেই দাঁড়িয়েছিল, কাছে একটা টগর ফুলের গাছ। একটি ছেলে ফুল তুলে রমেশের কাপড়ে দিচ্ছিল।

চামেলী রোষভরে তাদের পাশ কেটে চলল। তাদের দিকে তাকাল না।

রমেশ ছুটে এসে হাত চেপে ধরল—বেশ আক্কেল তোমার দিদি, আমি তোমায় ডাকলাম—তুমি না শুনে চলে যাচ্ছো।

চামেলী থমকে দাঁড়াল, একটু হেসে তার চোখের ওপর থেকে পড়ে যাওয়া চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বললে—পথে দাঁড়িয়ে কি কথা শুনবো ভাই? বাড়ি চল, কথা শুনবো এখন। দেখিসনে, ভিজে কাপড়ে রয়েছি!

রমেশ বললে—এখন গিয়েই তো পূজোর যোগাড় করবে দিদি। চারটি ফুল নিয়ে যাও না, পূজোয় দিয়ো।

পেছন থেকে রুক্ষকণ্ঠে সরলা দেবী বলে উঠলেন—মিছে বকিসনে রমেশ। তোর দিদিকে কখনও দেখেছিস পূজোর যোগাড় করতে?

থতমত খেয়ে রমেশ বললে—না। দিদিকে কই তুমি যোগাড় করতে দাও ঠাকুমা? তা তুমিই নিয়ে যাও না। দেখ দিকিন কি সুন্দর টাটকা ফুল!

ঠাকুরমা তেমনি সুরেই বললেন—হাঁ আমার তো আর খেয়ে কাজ নেই তাই, নায়ায়ণের পূজোর জন্যে তোদের এই বাসী কাপড়ের যা তা হাতে তোলা ফুল নিয়ে যাবো। ও ফুলে কখনও পূজো হয়?

যুবকটি অগ্রসর হয়ে এলো, হাসিমুখে বললে—কেন দিদিমা,

এ ফুল দিয়ে কেন পূজো হতে পারে না? জগতের সব জিনিসই তো তাঁর পূজোর জন্যে সৃষ্টি হয়েছে ফুল সেই জন্যে। এর মধ্যে পবিত্রতাই রয়েছে অপবিত্রতা এতে পাচ্ছো কোথায়? তোমাদের সব বাড়াবাড়ি কিন্তু যেমন ভাবেই তোলা হোক না কেন, নারায়ণ সব নেন।

অবজ্ঞার হাসি হেসে সরমাদেবী বললেন—ওই সব তোদের এক কথা। কেউ চায় এমন পুজোর যোগাড় করতে? কেউ চায় যেমন তেমন হাতে পূজোর ফুল তুলে নিতে? বাসী কাপড়ে ফুলগুলো তুলে নষ্ট না করে, চান করে তুললেই তো নারায়ণের পূজোয় লাগত।

প্রতাপ চিন্তিত মুখে বলল—পূজার জোগাড় কে করতে চাচ্ছে তা তো বুঝতে পারলাম না।

রমেশ বলে উঠল—দিদি আর জ্যেঠাইমাকে ঠাকুমা পূজোর ঘরে যেতে দেন না। রান্নাঘরে যেতে দেন না, পূজোর জোগাড় করতে দেন না।

প্রকাশ চামেলীর দিকে তাকিয়ে করুণকণ্ঠে বললে—ওঁদের অপরাধ কি এমন বেশী দিদিমা? বাস্তবিক আমি জানতাম না আমাদের দেশে—আমাদের সমাজে এতখানি গলদ আছে! কানাই মামার অপরাধ, তিনি তোমাদের না জানিয়ে বিয়ে করেছিলেন। ওর জন্যে তোমরাই ছেলের ওপর রাগ করে দেশে প্রচার করলে, কানাই মানা জাত না জানা কাদের মেয়েকে বিয়ে করেছেন।

আজ এই মেয়েটি এখানে এসে রয়েছে। তোমরা যদি নিজেরা এদের তুলে নিতে, সমাজ এরকম ভাবে শুধু এদের নির্য্যাতিত করতে পারত না।

যদি এদিক দিয়ে না দেখে—অন্ততঃ মানুষ হিসেবেও এদের দেখতে পারতে দিদিমা। ঘৃণা করে এতখানি দূরে এদের কখনও রাখতে

পারতে না। কেন না তোমার মধ্যে যে ভগবান, এদের মধ্যেও সেই ভগবান বিরাজ করছেন।

তবে আর এত দ্বিধা কেন? যে সূর্য্যের আলো গঙ্গা জলে পড়ে, সেই সূর্য্যের আলো নর্দমার অপরিষ্কার অপবিত্র জলেও পড়ে। যে বৃষ্টি—গঙ্গার জল বাড়ায় সে বৃষ্টি কূপের জলও বাড়ায়। জিনিস তো একই দিদিমা, ঘৃণা করবার মতো এর মধ্যে কিছুই তো নেই। তুমি যেখান থেকে এসেছ, একজন ছোট জাতও সেইখান থেকে এসেছে। আবার তুমি যেখানে যাবে সেও সেখানে যাবে। দু'দিনের জন্যে সংসারে এসে এই ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার। তোমারই মত আর একজনকে একেবারে হেয় করে অনেক দূরে সরিয়ে রাখা, এসব কি উচিত?

এ দেশের সমাজ এমনি করেই না দিন দিন অবনতির পথে আরও এগিয়ে চলেছে। এইসব সংস্কার এ দেশের সমাজের বুকে বদ্ধমূল থেকে গেছে, আজ যদি তুমি এই সংস্কার ত্যাগ করে একজন ঘৃণ্য নীচ জাতকে তোমার পাশে টেনে নাও লোকে তোমার নিন্দে করবে, কিন্তু সে নিন্দের ভয়ে তুমি মিথ্যে নিয়ে ভুলে থাকবে? সত্যকে বরণ করবে না?

এ নিন্দে তোমার বেশী দিন থাকবে না। দু'দিন বাদেই দেখবে—আর একজন তোমার দৃষ্টান্ত নিয়েছে, তার দেখাদেখি আরও দশজন নেবে, এমনি করে আমাদের দেশের এই সমাজের বুক থেকে এ সংস্কারগুলো উঠে যাবে।

অত্যন্ত রেগে উঠে প্রতাপের মুখের কাছে হাত নেড়ে সরমা দেবী কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন—হ্যাঁ সব উঠে যাক্, হিন্দু ধর্ম্মটা চুলোয় যাক্, তোর ওই ধেষ্টামী যত সংসারে সবাই মেনে নিক্ কেমন?

প্রতাপ হেসে উঠল তুমি খুব রেগে উঠেছো না! তোমায় আর বেশী রাগাব না। তুমি বাড়ী যাও দিদিমা। আমি আর একদিন তোমায় অনেক কথা শুনিয়ে আসবো তোমার বাড়ীতে গিয়ে; যাতে তুমি—

বাধা দিয়ে তীব্র স্বরে সরমা দেবী বললেন—দরকার নেই বাপু। আমি তোমার ও ধর্ম্মের উপদেশ শুনতে চাইনে। যা আমার আছে, এই ভালো। নতুন করে ধর্ম্ম নিতে আমি চাইনে।

আচ্ছা চামেলী, তুই বাপু হাঁ করে তাকিয়ে কি শুনছিস্ বল দেখি? এতক্ষণ বাড়ি গেলেই তো হতো। এসব কথা আবার মানুষে শোনে? ছ্যাঃ ছ্যাঃ। দেশের জাত ধর্ম্ম আর রাখতে দেবে না, প্রতাপ সব মাটি করবে দেখছি।

বাস্তবিক চামেলী বিস্ময়ে এই ছেলেটির দিকে তাকিয়ে ছিল, তার কথা শুনছিল। এদেশে বুঝি সে এই প্রকৃত একজনকে দেখল যে তাদের—শুধু তাদের কেন পতিত কাউকে ঘৃণা করে না, মানবধর্ম্ম পালন করা যার ধর্ম্ম এবং সেজন্য সে সকলকে কাছে টেনে নিতে চায়।

সরমা দেবীর কথায় সে চম্‌কে উঠল, তখনই বুঝি মনে পড়ল অপরিচিত এক যুবকের সামনে এরূপ সিক্ত বস্ত্রে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ ভদ্রতা বিরুদ্ধ।

তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়ে চলল—আর পেছন ফিরে চাইল না।

॥ আট ॥

মঞ্জু ও চামেলীর সঙ্গে প্রতাপের অচিরে আলাপ হয়ে গেল। শুধু এখনে নয়, যেখানে ঘৃণা উপেক্ষা সেই খানেই এই ছেলেটি ঘৃণিত উপেক্ষিতের পক্ষে দাঁড়ায়। এতে সমস্ত সংসার তাকে যতই উপহাস করুক সে তাতে ভ্রূক্ষেপ করত না।

এই সরল উদারমনা ছেলেটিকে সমাজ একটু দূরে রেখেই চলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে নিজে থেকে জোর করে সমাজের বুকে নিজের স্থান গড়ে নিল।

দেশের জনসাধারণ তাকে বরাবর একটু দূরে রেখে চলছিল, কেবল যখন নিতান্ত প্রয়োজন ঘটত তখন কাজের প্রত্যাশায় তার কাছে ছুটত।

যেখানে অভাব, অভিযোগ, অত্যাচার ছেলেটি সেইখানেই গিয়ে অটলভাবে দাঁড়াত। অত্যাচারির সাজা দিতে উঠে পড়ে লাগত। যত্নে অভিযোগের প্রতিকার করত, অনেকের অভাব মোচন করত।

তার অর্থের অভাব ছিল না। পিতা যে প্রচুর সম্পত্তি রেখে গেছেন, সে তার একমাত্র অধিকারী। দেশের লোক সামাজিক হিসাবে তাকে দূরে রাখলেও তার কাজের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারত না। কেননা তাকে অনেক সময় অনেক উপকারে পাওয়া যেত।

দেশকে সকল প্রকারে উন্নত করবার জন্য সে প্রাপণে চেষ্টা করত, কিন্তু দেশবাসীর উপেক্ষার ফলে তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেত, তথাপি সে আশা ছাড়েনি, দেশের কুসংস্কার দূর করবার জন্য সে বদ্ধপরিকর।

*　　*　　*　　*

পরদিন দুপুরে চামেলী মায়ের অনুমতি নিয়ে চুপ করে বার হচ্ছিল, খাওয়ার পর ছায়া মুখ ধুতে ধুতে চামেলীকে বের হতে দেখে জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাচ্ছো চামেলী ?

চামেলী কুণ্ঠিতভাবে বললে—এই এদের বাড়ি।

মুখখানা একটু অপ্রসন্ন করে বললে—ওদের বাড়ি তোমার না যাওয়াই উচিত। জানো তো অনিমার শাশুড়ী কম লোক নন্, ওঁদের ভারী শুচিবাই।

চামেলী থমকে দাঁড়াল। তাকে দাঁড়াতে দেখে ছায়া ফিরে বললে—যাবে যাও, ওদের বাড়ি কিন্তু একটু সাবধানে থেকো। লোকের বাড়ি বেশী যাওয়া ভাল নয়।

অনিমার তখন খুব জ্বর এসেছিল। একখানা কম্বল মুড়ি দিয়ে মেঝের একটা মাদুরের ওপর সে পড়েছিল, শাশুড়ী পাশের ঘরে শুয়ে প্রাত্যহিক দিবানিদ্রা উপভোগ করছিলেন।

দরজা খোলার মৃদু শব্দে তার সতর্ক নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। জড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন—কে গা ?

—আমি চামেলী।

প্রবেশ পথে বাধা পেয়ে চামেলী এমন থতমত খেয়ে দাঁড়াল যেন সে চুরি করতে এসেছে।

তার আসা গৃহিণীর মোটে পছন্দ নয় তবে নেহাৎ অভ্যাগত.; শাস্ত্রে আছে বাড়ি বয়ে এলে তাড়ানো মহাপাপ। সেই জন্যই বিরক্তি দমন করে পাশ ফিরে শুয়ে ভারী সুরেই বললেন—ঠিক দুপুর বেলা সদর খুলে রেখো না, ভেজিয়ে দাও। কে জানে কার মনে কি আছে। কথায় বলে দিন যায় না ক্ষণ যায়, মানুষকে কখনও বিশ্বাস করতে আছে ?

চামেলী দরজা ভেজিয়ে বরাবর অনিমার কাছে গিয়ে বসল। তার

সাড়া পেয়ে অনিমা কাপড়ের ঢাকা থেকে মুখ বার করেছিল—আরক্ত স্ফীত চোখ দুটি কিন্তু বেশীক্ষণ মেলে রাখতে পারল না। চামেলী তার মুখ চোখ দেখে বুঝল জ্বরের পরিমাণ আজ কত, তাহলেও তার কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠল, ইস আজ যে তোমার ভয়ানক জ্বর দেখছি ভাই।

অনিমার মুখে হাসির মৃদু রেখা জেগে তখনই মিলিয়ে গেল, মুখখানা বালিশের মধ্যে গুঁজে সে অস্ফুট কণ্ঠে বললে—রোজই এমন হয় ভাই। আজ জ্বরের জোর খুব বেশী নয়।

চামেলী ব্যস্ত হয়ে বলল—এত জ্বরে মাথাটা ধুইয়ে কিম্বা জলপট্টি দিলে ভালো হতো। তোমার শাশুড়ীকে বলবো একটু জল দিতে?

উৎকণ্ঠিতা অনিমা বললে—না না, ওঁকে ডাকবার কোনো দরকার নেই। ওই ঘটিতে জল আছে মাথায় আর দিতে হবে না—আমার মুখে একটু দাও। বড় তৃষ্ণা, বুক শুকিয়ে উঠেছে।

চামেলী বললে—ওই নোংরা ঘটিতে বাইরের জল আছে তাই খাবে? খাবার জল নেই।

অনিমা পাশ ফিরে পরিশ্রান্ত কণ্ঠে বলল—যথেষ্ট আছে কিন্তু কি করে তুমি দেবে ভাই? সব কথা না জানতে পারো কতক তো জানো, কাল ঘাটে গিয়ে তোমার সঙ্গে গল্প করেছিলাম—উনি কোথা থেকে তা শুনেছিলেন। নিজে যা তা বলে অপমান তো করলেনই। তারপর রাতে উনি বাড়ি এলে, দশকথা বলে আমায় কি শাস্তিই না দেওয়ালেন।

উঃ বুকের পাঁজরা এক একখানা খসে পড়ে ভাই, কেমন করে সব কথা বলি? ভগবানকে জানাই আবার যদি জন্ম দাও বাংলার মেয়ে করে যেন পাঠিয়ো না আমায়। তার চেয়ে ঘৃণিত বিষ্ঠার কীট করো সেও ভালো, তবু বাংলার মেয়ে যেন আর না জন্মাই, মাগো!

তার চোখ দিয়ে দর দর ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। চামেলী নির্ব্বাক বেদনায় তার চোখ মুছিয়ে দিতে লাগল। বেদনায় তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়েছিল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে অনিমা বললে—কিছু বলিনি ভাই, কিন্তু আর যে বুকের ভিতর এ ব্যথা চেপে রাখতে পারছিনে। তোমায় একটা কথা বলে যাই চামেলী, কখনো বিয়ে করো না। জেনে শুনে এমন তিলে তিলে মরণের পথে এগিয়ে যেও না। তার চেয়ে বিষ খেয়ে জলে ডুবে মরো শান্তি পাবে।

অভাগিনী বাংলার মেয়ে, যাতনায় বুক ফেটে গেলেও একটি কথা তবু মুখে আনবে না, আনলেও কেউ শুনবে না, শুনলেও তোমার নিন্দে করবে। জানিনে কোনকালে কোন মহামুনি বুঝি আদর্শ কোনো স্বামীকে দেখেছিলেন তাই তিনি ধারনা করেছিলেন—দুনিয়ার সকল পুরুষই দেবতা, তাই তিনি নারীকে এই দেবতার প্রতি সর্বক্ষণ ভক্তিমতী থাকতে উপদেশ দিয়ে গেছেন। হায় রে স্বামী দেবতা! আজ যদি সেই মুনি বেঁচে থাকতেন—আমিই তাঁর সে ভুল ভেঙে দিতে পারতাম।

একটু থেমে রুদ্ধ কণ্ঠে অনিমা আবার বললে—দেবতার দয়ায় সহস্র চিহ্ন আমার দেহে। শুধু প্রহার নয় কুৎসিত ব্যায়রাম লোকে যাকে ঘৃণা করে তা পর্যন্ত আমায় দিতে দেবতা ভোলেন নি। হাজারে হয়তো কোথাও একটি পুরুষ যথার্থ স্বামী হতে পেরেছে আর সব এমনি এমনই স্বার্থপর। ভগবান্ উঃ! একটু জল দাও বোন, ওই কলসীতে জল আছে। ঘটিতে ঢেলে নিয়ে আমার মুখে দাও।

চামেলী কেমন থতমত খেয়ে গিয়েছিল। একটু থেমে বললে—কলসী ছোঁব?

অনিমা শান্ত স্বরে বললে—তুমি যে এ ঘরে এসেছো এতেই কলসী যা অপবিত্র হবার হয়ে গেছে। ওই জলই আমায় দাও। বড় তৃষ্ণা।

চামেলী তাড়াতাড়ি কলসী থেকে জল এনে অনিমার মুখে দিল। সন্ধান করে একটু কারো কাপড়ের খণ্ড বের করে অনিমার মাথায় জলপট্টি দিয়ে বাতাস করতে লাগল। অনিমা একবার দু'বার নিষেধ করল, চামেলী সে নিষেধ কানে তুলল না। চামেলীর সেবায় শ্রান্ত অনিমা অচিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনিমার স্বামী মহেশ খাওয়ার পর পাড়ায় তাস খেলতে বের হয়েছিল। এই সময়ে সে ফিরে এলো। তার সাড়া পেয়ে চামেলী পাখা রেখে উঠল, সেই সময়ে মহেশের মা এসে দরজার পাশে বসলেন ; তাঁর আগমনে ভরসা পেয়ে চামেলী অনিমার পাশে বসল।

মহেশ ঘরে ঢুকেই চামেলীকে দেখে দাঁড়াল। কোনোদিন চামেলীকে সে দেখেনি। সেজন্য তাকে চিনত না। মায়ের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে সে জিজ্ঞাসা করল—এ মেয়েটি কে ?

মা গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বললেন - ওমা একে তুই চিনতে পারলিনে মহেশ ! এ যে আমাদের সেই মেয়ে—যাদের নিয়ে এত গোলমাল হচ্ছে। তুই-ই তো কত কাণ্ড করলি। কত কথা বললি—ও হরি। এদের না দেখে না চিনে এত কাণ্ড করলি কি করে ?

চামেলীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। নতমুখে সে আর একখানা পট্টি ভিজিয়ে অনিমার কপালে সেখানা বসিয়ে দিল।

বিকৃত মুখে মহেশ বললে—ওকে আর অত যত্ন করতে হবে না। মেয়েমানুষের রোগে এত সেবা ভাল নয়। ওতে ওরা বেজায় আয়েষি হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত আয়েষ পেয়ে এরপর পেটে খেতে চাইবে না, কোনোদিন পা হাত কামড়ালে আমাকেই হয়তো বলবে টিপে দিতে।

মায়ের মুখ করুণ। মা বললেন—ঠিক কথা বলেছিস মহেশ। একবার আয়েষ পেলে কি আর কষ্ট করতে চায় কেউ ? সামান্য

একটু পা হাত ব্যথা করলেই অমনি শুয়ে পড়বে। এখন সেবা করবে কে? ঠিক বলেছিস্।

চামেলী শান্ত অথচ মৃদু কণ্ঠে বললে—সেবা তো আমি কিছুই করছি নে। জ্বরটা বড্ড বেশী হয়েছে বলেই মাথায় জলপট্টি দিচ্ছি। এতে উপকার হবে জ্বরটা কমবে।

মহেশ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—আরে নাও ওসব রেখে দাও। আমাদের জ্বর হলে অমনি পড়ে থাকি, কে কত মাথায় জলপট্টি বাতাস দেয়? যত সব ধিষ্টেমা। ওসব ছেড়ে দাও বাপু। দিয়ে ছাখো জ্বর হলে আপনা আপনি যায় কিনা।

স্বামীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অনিমার ঘুমের ভাব চলে গেল। কিন্তু সে চোখ কিছুতেই মেলতে পারছিল না। চুপ করে পড়ে সকলের কথা শুনছিল। নিদারুণ অভিমানে তার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল; তাই কপাল থেকে জলপটি তুলে নিয়ে দূরে ফেলে আপাদমস্তক কম্বলে ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল।

চামেলী মহেশের মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে—আজ কদিন থেকে এমনি জ্বর হচ্ছে, একজন ডাক্তার দেখিয়ে একটু ওষুধের বন্দোবস্ত করলে জ্বরটা এতদিনে সেরে যেতো। একে অসুস্থ শরীর তার ওপর এমনি করে রোজ যদি জ্বর আসে, তাহলে কেমন করে বাঁচবে বলুন তো?

মহেশ একটু তীব্র ভাবেই বললে—মাথার দিব্যি দিয়ে কে ওকে বাঁচতে বলেছে। তোমার কোনো ভয় নেই। মেয়েদের বড় একটা কিছু হয় না, ওরা অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে জন্মায়। মেয়ে জাতটাকে বুঝেছে মা যত আস্পর্দ্ধা দেবে, ততই ওরা বাড়তে চাইবে। আজ জ্বর হয়েছে বলে ডাক্তার আনবো, কাল দাঁতে ব্যথা হয়েছে ডাক্তার আনতে ছুটবো, বলি ভিজিটের টাকা গুণবে কে? সব যদি ডাক্তারকে দিই তাহলে যে পেটে খেতে পাবো না।

মা একটা দম নিয়ে বললেন—অবাক করলে বাছা! খিষ্টেমী যত আর কাকে বলে? মেয়েদের ব্যারাম হলে একমাত্র প্রতাপের বাড়ি ছাড়া আর কারও বাড়িতে ডাক্তার এসেছে বলে মনে হয় না।

আমরাই কতবার মরতে বসেছি। আবার পরে বেঁচেও উঠেছি। তবু জোর করে বলতে পারি কখনো একদাগ ওষুধ খাইনি। তোমাদের ঘরে ওসব চলতে পারে বাছা, আমাদের ঘরে চলবে না।

তার পর চোখটা একটু টেনে মুখে অদ্ভুত ভঙ্গী ছুটিয়ে চাপা সুরে তিনি বললেন—তোমাদের বাছা সবই অদ্ভুত। সবতাতে বাড়াবাড়ি। এই যে আদত খিষ্টেন প্রতাপটা তোমাদের বাড়ি যাওয়া আশা করে তোমার ঠাকুরদা, ঠাকুমা তো চোখ বুজে থাকেন। কোন দিন চোখ তুলে দেখেন না। কিন্তু আমাদের বাড়ি একবার এলে আমরা মাথায় ঘোল ঢেলে বিদেয় করবো। ও রকম খিষ্টেনকে আমাদের বাড়ি ঢুকতে দিলে তবে তো ঢুকতে পাবে! না খেয়ে মরি রোগে ভুগে মরি সেও আমাদের ভালো বাছা তবু খিষ্টেনকে আমরা বাড়িতে আসতে দেবো না। আমাদের বাছা আর কিছু না থাক জাত ধর্ম মেনে চলি। বলি সে সব তো বিসর্জন দিতে পারিনে।

চামেলী মাথা নীচু করে বসে রইল। ভেবে দেখল, এতে তার বলবার কিছু নেই। অনিমার যাই হোক না কেন, তাতে তার কি? অনিমা পরের—তার সম্বন্ধে কথা বলতে যাওয়াই অনুচিত।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে খানিকক্ষণ বসে রইল। কারণ এখনই উঠে আসতে ভদ্রতায় বাধছিল।

॥ নয় ॥

বিকালে সে যখন বাড়ি ফিরল তখন প্রতাপ বাড়ি থেকে বের হচ্ছে।

—এই যে চামেলী কোথায় গিয়েছিলে ?

শান্ত ভাবে চামেলী বললে—এই পাশের বাড়িতে। আপনি চলে যাচ্ছেন আমার যে কতকগুলো কথা বলবার ছিল।

প্রতাপ ফিরল; আসতে আসতে বললে—চলো যা বলবার আছে বলে নাও। আমার আবার অন্যদিকে একটা জরুরী কাজ আছে কিনা এখনই যেতে হবে।

প্রতাপকে বসিয়ে একটু ঝাঁঝানো সুরে চামেলী বললে—আজ পাশের বাড়ির বউটির দুর্দ্দশা দেখে এলাম প্রতাপদা। দেখে চোখের জল সামলাতে পারিনে। আচ্ছা বলতে পারেন, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক মেয়েদের এমন অবহেলার চোখে দেখে কেন ? মেয়েদের ভালো মন্দ কষ্ট দুঃখের দিকে তাকায় না কেন ? কল যেমন চালানো হয়, এদেশে মেয়েদেরও তেমনি চালানো হয়। কেবল কাজটাই এদেশের লোক নিতে চায় শুধু কাজই আদায় করে। আচ্ছা এ দেশের মেয়েদের কি জাগিয়ে তোলা যায় না ? এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি জাগানো কি সম্ভব নয় ? চিরদিন এইসব পশুর অত্যাচার এমনি করেই মেয়েদের সইতে হবে ? ভগবানের অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলে করবে সে অত্যাচার। আর তারা তাই মাথা পেতে নেবে ?

প্রতাপ হাসতে গেল। কিন্তু মুখে হাসি ফুটল না। জাগল নিবিড় যাতনা। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে সে তাকিয়ে রইল।

*　　*　　*

সেদিন বাইরে থেকে বাড়ি ফিরেই হরিদাস মুখ ভারী করে পুত্র-বধুকে ডাকলেন—এদিকে এসো তো বাছা। তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

মঞ্জু এখানে এতদিন এসেছে, এর মধ্যে হরিদাস কোনদিনই তাকে ডেকে কোনো কথা বলেননি। আজ তাঁর আহ্বান শুনে কি এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় মঞ্জুর বুক কেঁপে উঠল। বেশী করে মাথায় কাপড় দিয়ে সারা গায়ে আঁচল টেনে সে কাঁপতে কাঁপতে এসে শ্বশুরের কাছে দাঁড়াল।

বারন্দায় একখানা পিঁড়িতে বসে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে হরিদাস হুঁকায় তামাক খাচ্ছিলেন। পুত্রবধূকে দেখে সোজা হয়ে বসলেন, মুখ থেকে হুকা সরিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—এসব কি ব্যাপার হচ্ছে বউমা। এরকম করা তোমাদের কি উচিত হচ্ছে! একে তো তোমাদের এনে যে বাড়িতে রেখেছি তাতেই অনেক কথা শুনতে হয়েছে; এখনও শুনছি। তা যাক। তাতে আমি ভয় করিনে। কেননা, অনেক আগেই আমি আমার কর্তব্য ঠিক করে নিয়েছিলাম কিন্তু তার পরে এই যে সব ব্যাপার একি ভালো হচ্ছে?

অনুমানে মঞ্জু কথাটা বুঝে নিল। তাহলেও জিজ্ঞাসা করল কি হচ্ছে বাবা?

বিকৃত মুখখানা আরও বিকৃত করে হরিদাস বললেন কি হচ্ছে? লোকে যে আমার গায়ে থুতু দিচ্ছে বাছা। আমার যে মুখ দেখানোর পথ তোমরা বন্ধ করেছো। কোলকাতায় যা খুশী তাই করতে, আমি কোনদিন তার জন্যে কোনো কথা শুনতে যেতাম না।

কিন্তু এখানে এলে কি বাছা এই জন্যে? এই যে প্রতাপ দিন রাত আসা যাওয়া করছে, চামেলীও নাকি তাদের বাড়ি যায় আসে

তার মার সঙ্গে মিলে কাল সারা দিন নাকি মুসলমান পাড়ায় ঘুরেছে। ছি, ছি, লোকে আমায় যা বলছে, তা তোমাদের আর কি বলবো। আমি তো আর মুখ দেখাতে পারি না।

পেছন থেকে সরমা দেবী টিপ্পনী কাটলেন—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় বলে যে কথা আছে, তোমার হয়েছে তাই। কোলকাতায় যা খুশী তাই করছিলে, তোমার এত কি মাথা ব্যথা ধরেছিল যে সাত তাড়াতাড়ি ওদের আনতে গেলে? যার জন্যে সম্পর্ক, সেই ছেলেই যখন তোমার নেই, তখন ওদের আমার তোমার কোন দরকার ছিল না।

কার মেয়ে, কোন ঘরে জন্ম কে জানে! কানাই ওকে সত্যি বিয়ে করেছিল কিনা তা নিয়েও কথা ওঠে। শুনছি কলকাতায় নাকি অনেক বেশ্যার মেয়েরও এমনি ধারা বিয়ে হয়। হয়তো কানাই বিয়ে করেছে বলে আমাদের ধাপ্পা দিয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায় এমনি সব ঘোট হয়।

ওদের চালচলন দেখে এখন আমারও যেন কেমন মনে হয়। সত্যি ভদ্দর ঘরের মেয়ে হলে কখনো এমন চালচলন হয়?

মঞ্জুর চোখের সামনে সারা বিশ্ব দুলে উঠল। সে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল, তার দুই চোখ ঝাপিয়ে ঝর ঝর ধারে অশ্রু ঝরল। ভগবান! এমন জঘন্য কথাও আজ শুনতে হলো, এই সব কথা শুনতেই কি এখানে এসেছিল? স্বামী দেবতা তুমি আজ কোথায়? আজ এই মুহূর্তে একবার এসে বলে যাও, আজ তুমি ছাড়া আর কেউ প্রমাণ করবার নেই যে মঞ্জু তোমার বিবাহিতা স্ত্রী।

ওই পাশের ঘরে সিংহাসনে তুমি বসে আছো নারায়ণ! সেদিন কি তুমি সাক্ষী ছিলে না? আজ এ সময়ে সতীকে অসতী প্রতিপন্ন করার মুহূর্তে হে সত্য দেবতা তুমি নীরব কেন? ওগো নিদ্রিত দেবতা, তুমি যে আছো তা জানাও, জানাও যে মঞ্জু কুলটা নয়। বেশ্যা নয়,

কানাইয়ের, রক্ষিতা ঘৃণিতা কিছুই নয় সে। কানাইয়ের ধর্ম স্ত্রী, সে সতী।

কেউ সাড়া দিল না। নারায়ণ যেমন তেমনি রইলেন, তাঁর স্বামীরও আসার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না।

আকাশ বাতাস সমভাবে রইল। ঝড়ও উঠল না। বাজও পড়ল না।

ঝড় উঠল শুধু সন্তানের বুকে। মাতার অপবাদ—বজ্রাগ্নি সৃষ্টি করল শুধু সন্তানের হৃদয়ে।

চামেলী গর্জে উঠল—কি? আমার মা বেশ্যার মেয়ে? আমার মা সতী নয়? ঘৃণিতা বেশ্যা আপনার ছেলের রক্ষিতা ছিল? আমি ঠাকুর বা নারায়ণ সাক্ষী করতে রাজী নই। ধর্ম যেদিন তার নিজস্ব পথ দেখাবে সেদিন জানবে। কিন্তু আমি বলতে চাই, আমার মায়ের নামে এমন বদনাম যারা করে, এমন ঘৃণিত কথা যারা বলে, তাদের আমি নিস্তার পেতে দেব না।

হরিদাস রেগে উঠল। মুখ বিকৃত করে বলে উঠল—সাবধান। তোমরা এমনি শাপ মন্যি করার আগে, এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

চামেলীও গর্জে উঠল—বেশ, বাড়ির খোঁটা দিচ্ছ? দরকার হয় গাছতলায় শোব, ভিক্ষা করে খাব, তবু তোমাদের—

হরিদাস বললে—মেয়েছেলের এত তেজ ভাল নয়, বৌমা।

—তেজ এমনি আসে না—তোমরা সব সীমাছাড়িয়ে যাবে—যা তা বলবে আর আমি মুখ বুজে বসে থাকব?

—বেশ ত, মুখ বুজে বসে থাকতে না পার ত পথ দেখ।

—নিশ্চয়ই, সে কথা তোমার মনে করিয়ে দিতে হবে না।

চামেলী সমান তেজের সঙ্গে উত্তর দিল।

হরিদাস অবাক।

এতটুকু সেদিনের মেয়ে, সে কোথায় পেল এত সাহস ? এত শক্তি ?

*　　*　　*

এদিকে সারা গ্রামের বুকে তখন রীতিমত একটি আন্দোলন সুরু হয়েছিল।

সে আন্দোলনের মধ্যমনি ছিলেন হরিদাস।

সেদিন গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃদ্ধের দল একটি রতীমত মিটিং আহ্বান করলেন।

বৃদ্ধ হারু খুড়ো সে সভায় বললেন—একি স্পর্দ্ধা গ্রামের বুকে ? এমন ত আমরা জীবনে আশা করিনি।

বৃদ্ধ দাসু মোড়ল বললে—আমরা বাঁচি মরি যাই করি, আমরা চাই গ্রামের মধ্যে একটা হিন্দুয়ানা থাকে—কিন্তু তা হচ্ছে না।

—দেশটা রসাতলে গেল।

—ধ্বংস হলো।

—ঘোর কলি।

—তবে প্রতিবিধান চাই, যা হোক।

—তারপর সকলে মিলে হরিদাসকে বললে—তুমিই এর প্রতিবিধান কর।

হরিদাস বললে—আমি কি করব।

—তুমি চামেলীকে শাসন করবে।

—না, তা হতে পারে না।

—কেন ?

—তারা আমার কথা শোনে না ?

—নিশ্চয় শুনবে—

—আমি অনেক বুঝিয়ে বলেছি—কোন ফল হয়নি তাতে।

—তাহলে উপায় ?

—উপায় আমি কি জানি ? তোমরা কর ?

—আমরা তোমাদের এক ঘরে করব।

হরিদাস বললে—আমায় কেন তোমরা তা করতে যাবে ?

—তবে কাকে করব ?

—এই চামেলী আর তার মাকে কর তোমরা। না হয় প্রতাপকে কর সেই সঙ্গে।

—কিন্তু চামেলী আর মঞ্জু তোমাদের বাড়িতে থাকে।

—না তারা থাকবে না।

—কেন ?

—তারা বলেছে তারা পৃথক থাকবে ?

—কে বলেছে ?

—চামেলি !

সকালে হতভম্ব।

—বললে—কোথায় যাবে ?

—তা জানি না।

—তুমি মিথ্যা বলছ না ত ?

—মোটেই না। আমি খাঁটি সত্যি কথাই বলছি।

—কি করে জানলে ?

—আমি আপত্তি করায় আমার সঙ্গে ঘোর বিবাদ হয়ে গেছে।

—বেশ। তবে এই কথাই ঠিক হলো—আমরা চামেলি আর তার মাকে একঘরে করতে বাধ্য হবো।

সকলে একবাক্যে এ কথায় সায় দিলে।

এমন সময় সেখানে ঢুকল একজন যুবক। সবাই দেখলে, সে প্রতাপ।

প্রতাপ সেখানে এসে গম্ভীর ভাবে বললে—আপনারা কাকে একঘরে করতে চান ?

সকলেই বললে—চামেলীকে আর তার মাকে।

—কেন ?

—তারা সমাজ বহির্ভূত কাজ করেছে।

প্রতাপ হাসল।

বললে—সমাজ বহির্ভূত কাজ তারা করেনি ? তারা যা করেছে, তা মানুষের ভালোর জন্যেই করেছে ? কিন্তু তা করেছেন আপনারা ?

—আমরা ?

—হ্যাঁ। আমি তাহলে প্রকাশ করি, আপনারা প্রত্যেকে কি কি সমাজ বহির্ভূত কাজ করেছেন ?

হারু ঘুরে বললে—যাক্ যেতে দাও বাবাজী—

দাসু মোড়ল বললে—ছোট খাট বিষয় নিয়ে কি লাভ কথা বলে ?

—বলব না ?

—না।

তবে আপনারা কেন এ ভাবে সমাজকে টেনে নিয়েছেন ধ্বংসের পথে। আর আজ একজন প্রকৃত দেশকর্মী, মানব দরদীর মেয়ের নামে আর তার মায়ের নামে কুৎসা করছেন ? বিবেকে বাধছে না আপনাদের ?

সবাই চুপ করে রইল।

প্রতাপ বললে—কি ? তাহলে আমার ঘটনার সব সংকলন প্রকাশ করতে হয়। বলব ?

সকলে একবাক্যে বললে—ছি প্রতাপ, এসব এখন থাক। কেমন ?

—কিন্তু তা আপনাদেরও মনে থাকবে তো। তা না হলে মুক্তি নেই জানবেন।

কেউ কোন ? উত্তর দিলে না।

প্রতাপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে দুজন ব্রাহ্মণ বিদায় নিলে।

আর অপর ব্রাহ্মণেরাও উঠি উঠি করতে লাগল।

বাধ্য হয়ে সেদিনের মত সভা ভঙ্গ করে দিতে হলো। কিন্তু সে সময় এক ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি শিব-শঙ্করবাবু—সংক্ষেপে শিববাবু।

॥ দশ ॥

প্রতাপের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল চামেলা আর তার মা মঞ্জু।

প্রতাপের মা তাদের সাদরে ঘরে স্থান দিয়েছিল। তাই আজকের এত আলোড়ন।

ঠিক এই সময় কোলকাতা থেকে ধনী শিবশঙ্করবাবুও যে এখানে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভায় এসে উপস্থিত হবেন তা কেউ ভাবেনি।

তাঁকে সকলেই খাতির করে—গ্রামের সকলে তাঁকে মান্য করে—তিনি যখন গ্রামে আসেন একটা সম্ভ্রমের দৌড়ত্ব বজায় রেখে চলেন।

সেদিন বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তিনি।

পথে শুনলেন দুটি নিরীহ নারীকে নির্যাতন করার জন্যে একদল লোক সমবেত হয়েছে।

তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তারপর সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

তিনি সেখানে উপস্থিত হতেই সকলে থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

তিনি বললেন—কি হলো? আপনারা যা বলছিলেন তা—বলুন না?

সকলে থতমত খেয়ে একজন বললে—তোমরা চুপ করলে কেন? ওঁকে দেখে ভয় পাবার কি আছে? বলছিলুম—আমরা প্রতাপের মাকে গিয়ে জানাবো, হয় তিনি মা মেয়েকে পথে বের করে দেবেন, না হয় একঘরে করবেন।

হরিদাস মাথা দুলিয়ে বললেন—ঠিক কথা। লোকে হাসতে

হাসতে মরতে যেতে পারে, তবু সমাজ ত্যাগ করার কথা মনে করতেও পারে না।

শিববাবু বললেন—হ্যাঁ, সেটা আপনার পক্ষেই খাটি হরিদাসবাবু। এমন সমাজ ছেড়ে আপনারা বাঁচতে পারেন না। চামেলী আর তার মা—আপনার পৌত্রী ও পুত্রবধূ—

হরিদাস বললেন—একথা বলবেন শিববাবু—

সুদৃঢ়কণ্ঠে শিববাবু বললেন—আমি যে বিয়েতে নিজে উপস্থিত ছিলাম হরিদাসবাবু। সে বিয়ের আরো অনেক সাক্ষী আর পুরোহিত পর্যন্ত সবাইকে এনে আমি হাজির করতে পারি। আপনার ছেলে আর মঞ্জুর মার সেই বিয়ের প্রত্যক্ষ সব প্রমাণ চান?

হঠাৎ গর্জে উঠলেন হরিদাস। বললেন—তুমি তাহলে মহাসর্বনাশ করেছ শিবশঙ্কর। এক পতিতার সঙ্গে ব্রাহ্মণের ছেলের বিয়ে দিয়েই তোমরা—

ভুল করবেন না হরিদাসবাবু। মঞ্জুরমার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি মারা গেছেন—তাঁর মেয়েকে, আপনার এই সম্বোধনের উপযুক্ত শাস্তি তা না হলে হয়ত তিনি দিতে পারতেন। তারপর তাদের টাকাটা—

অতি কষ্টে রুক্ষভাবে হরিদাস বললেন—কিসের টাকা? কারও কোনও টাকার খবর আমি রাখি না—কখনও না।

শিববাবু বললেন—এতক্ষণে পথে এসেছেন দেখতে পাচ্ছি। তাদের ত ফাঁকি দিয়েছেনই—তার বাপ মা যা কিছু রেখে গেছেন তা থেকেও বঞ্চিত করার পথ ঠিক করেছেন। কিন্তু আজ বাদ কাল চোখ ত বুঁজতে হবে—তখন এ সম্পত্তি ত বারো ভূতে খাবে? চিরদিন ভোগ করতে ত আর আসেন নি।

হরিদাস কোনও কথা বলতে পারলেন না—রাগে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন।

একজন বললেন—এসব কথা যেতে দিন মশাই, আমরা না হয় মানলুম বিয়ে ঠিকই হয়েছিল। কিন্তু আমরা লোক পরম্পরায় শুনতে পেলুম তার মেয়ে চামেলী নাকি কুমারী নয়। খুব ছোটবেলায় তার বিয়ে হয়েছিল। তা হলে তাকে সমাজে কুমারী বলে চালিয়ে দেবার দরকার কি?

আর একজন বললেন—মেয়েটি দেখেতে ভালো, আমি ত ভেবেছিলুম আমার ছেলে বেচুরামের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেব। গিন্নী বলেন ছেলেটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি ত খারাপ কিছু দেখি না—

শিববাবু হেসে বললেন—বাঃ, তা ভাল পাত্রই ঠিক করে ছিলেন আপনি।

—কেন সে কি খারাপ? শুধু মাসের মধ্যে দশ বার দিন—

—খারাপ নয়, তবে মাসে দশ বারো দিন রাতে বাড়ি আসে না। আর যে সময় সে থিয়েটার করে।

—হ্যাঁ করে।

—আর মদ? খায়?

—তা থিয়েটার করতে হলে মাঝে মাঝে এক আধটুকু খেতে হয়।

—লেখাপড়া ত মা গঙ্গাই জানে—

—কেন ছয় কেলাস অবধি পড়েছিল।

শিববাবু হেসে উঠে বললেন—চামেলীর মত মেয়ের পায়ের নখের যোগ্য ছেলেই নয় আপনার বেচারাম। বুঝলেন?

সভায় একটা হাসির রোল উঠল।

প্রতাপ বললে—চলুন কাকাবাবু, এদের মাঝে কথা বলে আপনি মিথ্যা সময়ের অপচয় করছেন।

শিববাবু প্রতাপের সঙ্গে চললেন বাড়ির পথে।

হরিদাস শুধু জলন্ত চোখে তাঁদের পানে চেয়ে রইলেন।

*　　*　　*

প্রাত্যহিক আহ্নিক শেষ করে আঁচলটি গলায় জড়িয়ে প্রণাম করে মঞ্জু পূজোর ঘর থেকে বের হচ্ছিল, এমন সময় প্রতাপের মা কিরণময়ী বললেন—তোমায় শিবু ঠাকুরপো একবার ডাকছেন ভাই। বাইরের ঘরে বসে আছেন। কথাটা নাকি ভারী জরুরী। একটু তাড়াতাড়ি তোমায় ডেকে দিতে বললেন।

বাইরের ঘরে তক্তপোষের ওপর বসে শিবশঙ্কর ও প্রতাপ দেশের নানা কথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন—মঞ্জু প্রবেশ করা মাত্র দুজনের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল।

মঞ্জু বললে—কি এমন জরুরী কথা কাকাবাবু?

শিবশঙ্কর বললেন—হ্যাঁ মা, বিশেষ জরুরী কথা আছে বলেই তোমাকে তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি এখানে খানিক বসো।

মঞ্জু মাথা নেড়ে দরজার কাছে বসল।

প্রতাপ উঠে পড়ল। বললে—আপনারা ততক্ষণ কথাবার্তা বলুন আমি একটু ঘুরে আসি।

সে চলে গেল।

তারপর শিববাবু বললেন-জানো মা, দেশের লোক কুৎসা নিয়ে থাকতে চায়। আমি যখন তোমার পরিচয় দিলাম, তোমার বিয়ের সব কথা বললাম, তখন ওঁরা বললেন, তোমার বিষয়ে কিছু করা যাবে না। তাই তারা তোমায় ছেড়ে এখন চামেলীর পানে দৃষ্টি দিয়েছে।

উৎকণ্ঠিতা মঞ্জু বললে—আপনার একথা ত কিছু বুঝতে পারছিনে কাকাবাবু।

—তারা বলছিল চামেলীর বিয়ে হয়েছিল—সে বিধবা। তবু তাকে কুমারী বলে চালান হচ্ছে।

মঞ্জু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মনে মনে ভাবলেন, সত্য কখনও চাপা থাকে না। তবু তিনি কেন অযথা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে গেছেন।

চামেলী তার পিতাকে দেবতার মত ভক্তি করে। সে জানে তার পিতা যা করছেন ভালোর জন্যেই করছেন। সে তো জানে না যে তার মূল জীবন তার অজ্ঞাতে পিতা একেবারে শূন্য করে দিয়েছেন।

পাছে সেই শূন্যতার বেদনা তাকে কষ্ট দেয়, তাই তিনি নানা ভাবে সে ফাঁকে তালি দিয়েছেন। তিনি পিতা হয়ে যে মর্মভেদী কথা কন্যাকে বলতে পারেননি, মঞ্জু মা হয়েই বা তা কেমন করে বলবে?

মঞ্জু জানত, চামেলী নিজেই একদিন এ সত্য জানতে পারবে। সে তখন যা হয় করবে—কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ পাবে তা তিনি ভাবেননি।

মঞ্জুর চিন্তান্বিত মুখের দিকে চেয়ে শিববাবু বললেন—এ গোলমাল যে করে হোক আমাদের মেটাতে হবে। আর তা মেটাবার উপায়ও আমি ঠিক করে রেখেছি।

—কি উপায় বাবা?

—উপায় চামেলীর আবার বিয়ে দেওয়া।

—তা কি করে হয়?

—কেন?

—সে যে সত্যিই বিধবা কাকাবাবু।

—তা আমিও জানি? কিন্তু সেই কোন্ শৈশব থেকে এর জীবনটা নষ্ট করতে চাইনে আমি? সব জেনে শুনেই আমি বিয়ে দিতে চাইছি—দেবোও।

—আপনি চাইলেও আমি যে তা চাইতে পারছিনে বাবা।

—কেন? একটা ভুল সংস্কারের জন্যে? পাঁচ বছর বয়সে একটা রাতে কি ঘটনা ঘটেছিল তার জন্যে বারো বছর পরে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করতে চাও?

—আমি যে তাই মনে করে তাকে বক্ষচর্য শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলাম কাকাবাবু।

—হ্যাঁ, উপযুক্ত বয়েসে স্বামী স্ত্রীর প্রেম জন্মাবার পর স্বামী মারা গেলে তার স্মৃতিকে দেবতার স্মৃতি মনে করে নারী বেঁচে থাকতে পারে? তাই বলে কৈশোরের যে বিয়ের স্মৃতি যখন তার এতটুকুও মনে নেই, তখন সেই শিক্ষা কি তার জীবনকে মিথ্যায় ভরিয়ে দেবে না? তাই এ ধারণা ত্যাগ কর।

একটু থেমে মঞ্জু বললে—কিন্তু যদি তা মেনেও নিই কাকাবাবু, পাত্র পাব কোথায়?

হাসলেন শিববাবু।

বললেন—পাত্র আছে? আমি সে ব্যবস্থা করব।

—কে সে?

—প্রতাপ যদি তাকে গ্রহণ করতে রাজী হয়—

—কিন্তু তার যদি পরে সব জেনে দুঃখ পায় ত কি করবেন?

—নারী হিসেবে চামেলীর মত মেয়ে দুর্লভ। আর প্রতাপ উদার—হৃদয়বান্। আমার মনে হয় সব জেনেও সে নিশ্চয় চামেলীকে গ্রহণ করতে রাজী হবে?

—কিন্তু—

—না কোনও কিন্তু নয় মঞ্জু। শাক্ত মানে শুধু কঠোর তা নয়—তার বড় কথা হৃদয়।

—কিন্তু সবাই তা বোঝে না।

—কারণ শাক্ত সম্পূর্ণ তারা পড়ে নি। প্রধান কারণ বিধবারা সহমরণে যেতে পারতেন, বক্ষচর্য পালন করতেন আবার সন্তানহীনা

বিধবা, বিবাহও করতে পারতেন। কিন্তু সেই দরদপূর্ণ হৃদয় আজ কোথায়?

—চামেলী যদি সব জেনে রাজী না হয়?

—হবে না—আমার কথার বিরুদ্ধে সে কখনও যায় না আজও যাবে না।

—তা হলে—

—হ্যাঁ, আমি সুযোগ মত প্রতাপের কাছে এ কথা তুলব। তাহলে আজ আসি মা—পরে আবার কথা হবে।

—আচ্ছা কাকাবাবু।

মঞ্জু শিববাবুর পায়ের ধূলো নিলে। তিনি ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

॥ এগারো ॥

সকাল থেকে আজ চামেলীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না ?

তার নিয়মিত কাজ পূজোর যোগাড় করে দিয়ে যে কোথায় সরে পড়েছে।

চামেলীকে বাড়িতে না দেখে কিরণময়ী একটু ব্যস্তভাবে মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ চামেলীকে দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় গেছে সে ? বলে গেছে ?

উৎকণ্ঠিতা মঞ্জু বললে—কৈ না, আমায় তো কিছু বলে যায় নি।

অনেকক্ষণ কেটে গেল—চামেলী ফিরল না। অবশেষে পাড়ার একটা মেয়ের কাছে শোনা গেল, সে বাগানে গেছে।

ব্যস্তভাবে মঞ্জু বাগানে প্রবেশ করল।

বাগানে আজ চামেলী সকাল থেকে এতবেলা পর্যন্ত বসে রয়েছে—এই চিন্তায় মঞ্জু ব্যাকুল হয়ে উঠলে।

একটি লতাকুঞ্জের মধ্যে চামেলী উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

মুখখানি দুটি হাতের মধ্যে লুকোনো। আজানুলম্বিত কুঞ্চিত কালো কেশের রাশি অসংযতভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সমস্ত বাগান তখন বৈশাখের খররৌদ্রে তপ্ত হয়ে উঠেছে—ফুল, পাতা সে দারুণ তাপে শুকিয়ে উঠছে। এর মধ্যে এই মাধবীকুঞ্জটি বেশ শান্তি ও আরামের স্থান। রৌদ্রতাপ এখানে ঘেঁষতে পারে নি।

—চামেলী !

মায়ের আহ্বানে চামেলী চমকে মুখ তুলল। তার সমগ্র মুখ আরক্ত—দুটি চোখ স্ফীত, অশ্রুবর্ষন উন্মুখ।

মুহূর্তের মধ্যে মায়ের দিকে চাইতেই প্রবল অশ্রু তার চোখ দু'টি ঝাপসা করে দিল।

সে আবার মুখ লুকালো।

মা আন্দাজে কতকটা বুঝতে পারেন। তবু তিনি বলেন—কি হলো রে?

কোন উত্তর নেই।

—চামেলী, কেন এই ধূলো আর শুকনো পাতার মধ্যে পড়ে আছিস?

চামেলী উত্তর দিলে না—মুখ তুলল না।

মেয়ের পাশে বসে তার অসংযত চুলগুলো একত্র করে জড়িয়ে বেঁধে দিতে দিতে মঞ্জু বললে—কি হয়েছে বলবি নে চামেলী?

—না।

মুখ না তুলেই চামেলী বললে।

—কেন?

—জানি না—

—লুকুননী না আমায়। বল্ কি হলো—

মায়ের কোলে মুখটা তুলে উচ্ছ্বসিত কান্না দমন করে চামেলী বললে—কেন মা এসব কথা আমাকে আগে বলনি কেন, বলনি আমি বিধবা! যা কিছু ভাল, যা কিছু শুভ তাতে আমার অধিকার নেই। তা হলে আমি অতি নিকৃষ্ট—

তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

মঞ্জু নিজেকে সম্বরণ করে বললে—এই খানেই আমার মনে দুর্বলতা জেগেছিল চামেলী। এ জগতের কাছেও আমি জানাতে পারিনি, এমন কি তোকেও না।

—কেন?

—আমি চেয়েছিলাম একথা লুকিয়ে রাখব—যাতে বিশেষ কেউ জানতে না পারে।

—তা কি থাকে ?

—থাকে না জানি।

—তবে ?

—জানি সত্য একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই, তবু কেন যে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলাম ভগবান জানেন। যত দ্বিধা তর্ক ঝেড়ে আমি বলছি চামেলী আমি অন্যায় করেছিলাম। এখনও সময় আছে ভুল শোধরাবার। আমি স্থির নিশ্চিত, আমি সব দিক সামলাবো।

—কি করে ?

—তোর বিয়ে দেবো ?

—না মা তা হবে না—কিছুতেই না।

—কেন তা হতে পারে না শুনি ?

—অদৃষ্টে বৈধব্য ছিল তাই আমি বিধবা হয়েছি তাই আর—

—এ ভুল ধারণা—

—না, তা নয়। বিশ্ব জগতে আমি বিধবা। তা হলে এ উচ্ছিষ্ট ফুলে দেবতার পুজো কি করে হতে পারে মা ? আমি যা সেই ভাবই আমাকে থাকতে হবে।

এই বলে চামেলী কাঁদতে লাগল।

মঞ্জু জোর করে তার মুখ তুলে তা আঁচলে মুছিয়ে দিলেন।

মা বললেন—তুই উচ্ছিষ্ট এ তোর ভুল ধারণা চামেলী। তোকে অর্ঘ করে যার পায়ে দেওয়া হয়েছিল, সে ত নিতে পারেনি। যদি নিতো, তা হলে দুটি মাস যেতে না যেতে সে চলে যেতো না। পাঁচ বছরের মেয়ে তুই, ভাল করে কথা বলতে শিখিস্‌নি। বুঝতে পারলি নি কি হলো তোর অদৃষ্টে। কখন সে এলো কখন সে গেল। তখন তুই উপযুক্ত হোস্‌নি বলে তোর সে পুজো হলো অসার্থক।

চামেলী চুপ করে ছিল।

মঞ্জু বললে—আজ? আজ তোর সারা চিত্র ভরে যে হৃদয় ফুল ফুটেছে দেবতার পায়ে পড়বার জন্য তারা আকুল। তাদের শুকিয়ে মারিস্‌নে—নিজেকে পূজো থেকে বঞ্চিত করিস্‌নে।

একটু থেমে বললে—আর একটি কথা। তুই ত একা এ ক্ষেত্রে বঞ্চিত হবি নে—সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি প্রাণ বঞ্চিত হবে। আমি তোর মা—আমি কি স্বেচ্ছায় তোর কোনও অমংগল করতে পারি? না কোনও দিন পারিনে জানবি। তাঁর শেষ কথা কি ছিল জানিস্?

—না।

—তিনি বলেছিলেন, যদি কোন যোগ্য পাত্র স্বেচ্ছায় এসে গ্রহণ করতে চায়; তুমি তার হাতে ওকে তুলে দিও।

চামেলী চুপ করে রইল।

মঞ্জু বললে—তাঁর সেই শেষের দিনের কথাগুলো আজও যেন আমার কাণে বাজে। আমি যদি স্বামীর আদেশ শিরোধার্য না করি আমার তা মহাপাপ। ওঠ মা, এখন চল্। এভাবে এখানে পড়ে থাকলে লোকেই বা ভাববে কি? ওঠ, বাড়ি চল্—তারপর ভগবান যা করার তাই করবেন।

চামেলী অগত্যা উঠে বসল।

* * *

শিব শংকর যখন কিরণময়ীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তখন প্রতাপ বাড়িতে ছিল না?

চাকর জানাল—ছোটবাবু কখন আসবেন ঠিক নেই। তিনি সকালে উঠেই বাইরে গেছেন।

শিববাবু বললেন—তা যান। আমি তাঁর মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। বিশেষ দরকার আছে। তাঁকে গিয়ে বল যে শিববাবু দেখা করতে চান—বিশেষ দরকার আছে আমার।

ভৃত্য চলে গেল।

খানিকটা বাদে সে ফিরে এলো।

বললে—মা এসেছেন। আপনি এই ঘরে আসুন, বলে সে বাইরের ঘরের দরজা খুলে দিল। শিববাবু ঘরের ভেতরে গিয়ে চেয়ারে বসলেন।

একটু পরে ভেতরের দরজায় কিরণময়ী এসে দাঁড়ালেন।

শিবশংকরবাবু দুটি হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন—আসুন মা, বিশেষ দরকারে পড়েই আমাকে আজ আসতে হলো।

কিরণময়ী প্রতি নমস্কার করলেন।

বললেন—বলুন কি প্রয়োজন?

শিববাবু বললেন—আপনি কেন, এ গ্রামের অনেকেই আমায় চেনেন। কারণ আমি এখানে বেশি বাস না করলেও এ গ্রামের জন্যে অনেক কিছু আমি করেছি। তাই এই গ্রামবাসীর উপরে আমার দাবী আছে। বর্তমানে আমি গ্রামের সঙ্গে বেশি সম্পর্ক রাখি না—গ্রামের কলহের বাইরে থাকতে চাই।

শান্তকণ্ঠে কিরণময়ী বললেন—হ্যাঁ, আমি সব জানি।

—আপনার ছেলে প্রতাপের মত আমিও চাই গ্রামের সব কুসংস্কার দূর করতে; তবে সে যুবক পরিশ্রমী। আর আমরা বৃদ্ধ—তার উপরে কিছুটা কর্মহীন।

—কিন্তু যুগযুগান্তের কুসংস্কার দূর করা কি সহজ হবে?

—হবে না জানি। তবে চেষ্টা করতে হবে। একদিন দেশে যে সব আইন সামাজিক সংগ্রামের জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল আজকাল সে সব বিকৃত হয়ে যাচ্ছে? একটা সংস্কারের সঙ্গে দশটা নিজেদের মত ঢুকে যাচ্ছে। তাই বর্তমানের ভিত্তিতে সামাজিক আইনগুলো ঠিকভাবে সংশোধন করা উচিত।

—বুঝলাম। কিন্তু—

—জানি তা কঠিন ?

—হ্যাঁ, আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু এতগুলি লোক আর বিরাট সমাজের বিরুদ্ধে আপনারা মাত্র দু' এক জন কি করতে পারেন ?

—তা ছাড়া পুরোনো পালটে কিছু নতুন সৃষ্টি করতে গেলেই সমাজ তার উপর খড়্গহস্ত হবে। এমন কি তোমাকে খ্রীষ্টান বলবে—কত অত্যাচার সহ্য করতে হবে। মাঝে মাঝে এর মধ্যে আবার অনেক গ্রাম্য মাতবরের স্বার্থ এসে যাবে। তাতে ফল যা হয়—

কিরণময়ী বললেন—তাই তো বলছিলাম যে এ অতি দুরূহ কাজ।

—কিন্তু কাজ দুরূহ বলে নিস্করমার মতো বসে থাকলে চলবে না। একটা পথ বের করতেই হবে।

তা ঠিক। কিন্তু—বর্তমানে গ্রামের যা অবস্থা।

—এ অবস্থাকে চলতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। এই দেখুন এই গ্রামে—

এমন সময় হঠাৎ বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল—মাসীমা—

শিববাবু দেখলেন চামেলী এসে দাঁড়াল।

শিববাবুকে দেখে চামেলী বললে—একি, দাদু যে।

—হ্যাঁ দিদি।

চামেলী এসে শিববাবুকে প্রণাম করলে।

তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন—তোমার সব ইচ্ছা পূর্ণ হোক দিদি, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

কিরণময়ী হেসে বললেন—এর ইচ্ছা যে অনেক বড়। নিজে কত দুঃখ কষ্ট সইছে তার ঠিক নেই—অথচ ও চায় গ্রামের উন্নতি।

লজ্জিতা চামেলী বললে—আমি যাই মাসীমা, অনেক কাজ পড়ে আছে।

সে বেরিয়ে গেল।

শিববাবু বললেন—আমি এই চামেলীর জন্যেই এসেছিলাম মা।

কিরণময়ী বললেন—আপনি যা বলতে চান আমার মনে হয় আমি তা জানি। তবু বলুন—

—একদিন আমি মঞ্জু মায়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আজ অনাথিনী। আর আজ পল্লী সমাজ সে বিয়েটাকে পর্যন্ত অবৈধ প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু আমি জানি মঞ্জু মা সত্যিই বামুনের মেয়ে।

—আমি জানি তা।

—তাই আমার অনুরোধ, আজ ওরা যখন আপনার কাছে একটু আশ্রয় পেয়েছে, তখন সে আশ্রয় যেন গ্রামের লোকেদের বৈরীতার জন্যে ত্যাগ করতে না হয়।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমরা বেঁচে থাকতে এরা আশ্রয়চ্যুত হবে না।

—আপনার মঙ্গল হোক্ মা। ভগবানের কাছে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

শিববাবু আনন্দিত মনে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ভাবলেন, কিরণময়ীর মন তিনি যেন আরও অনেক বেশি বুঝতে পেরেছেন।

তাঁর সারা অন্তঃকরণ তৃপ্তিতে ভরে উঠল।

॥ বারো ॥

হঠাৎ চামেলীর প্রকৃতিটা যেন বদলে গেল।

চামেলী যেন হঠাৎ খুব গম্ভীর, ভারিক্কি হয়ে উঠল।

তা দেখে প্রতাপ যেন মুষড়ে গেল। যে ভেবে পেলনা ওর এই ভাবান্তরের কারণ কি?

সেদিন সন্ধ্যার পর শ্রান্তদেহে, ক্লান্ত মনে বেড়িয়ে এসে মায়ের সন্ধ্যানে দোতলার ছাদে এলো প্রতাপ।

এসে দেখে চামেলী মুক্ত ছাদে জ্যোৎস্নার আলোয় চুপ করে বসে আছে।

এরূপ নির্জনে একা থাকা চামেলীর মত উচ্ছল মেয়ের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাই তা দেখে প্রতাপ বিস্মিত হলো।

সে বললে—মা কোথায় চামেলী?

প্রতাপের কণ্ঠস্বর শোনামাত্র চামেলী ধড়মড় করে উঠে বসল। গায়ের কাপড় যথাসাধ্য ক্ষিপ্ত হাতে টেনে মৃদুকণ্ঠে বললে—মা নীচে গেছেন। আপনি নিচে যান, তাঁকে পাবেন।

শ্রান্তভাবে প্রতাপ ছাদের কার্ণিশে বসে বললে—আর ঘুরতে পারছিনে। এখানে বসলে কি তোমার অসুবিধে হবে?

চামেলী সংকুচিত হয়ে বললে—না, না, অসুবিধে হবে কেন? আপনি বসুন না।

কিন্তু নিজেই যে সে কুণ্ঠায়, লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। সে যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু উঠে যাবে কি করে?

প্রতাপ কি ভাববে তা হলে? না প্রতাপের সরল মনে এ ছায়া দেবার দরকার নেই। সে যেমন কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে যেন তেমনি বেড়াতে পারে।

এই সুদীর্ঘ একটা বছর চামেলী আর প্রতাপের সাহচর্য যেন নিত্যকার—প্রতি মুহূর্তের। আজ কেমন করে সে হঠাৎ সরে যাবে?

চোখ ফিরিয়ে সে তাকাল আকাশ পানে।

আকাশে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে যেন। দূরে গান গাইছে পাপিয়া। মিষ্টি তান ভেসে আসছে।

সারা বিশ্বে শুধু আলো আর আনন্দ। আর যত কিছু অন্ধকার সব যেন চামেলীর মনে।

সে আজ দিনের মধ্যে যতবার ভেবেছে বিধবার মত দিন কাটাবে। তার মা, প্রতাপের মা, কিরণময়ী প্রভৃতি যেমন তাঁদের স্বামীর স্মৃতি নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন আর দশের সেবা করছেন, সে তাই করবে।

কিন্তু তন্ন তন্ন করে অন্তর খুঁজে, সে কিছু পায়না, যাকে অবলম্বন করে সে দিন কাটাতে পারে। মনকে সে সুপথে রাখতে পারে।

কই তার ত স্বামীর স্মৃতি চোখ বুঝলে কোনও সময় মনে জাগে না। পুতুল খেলার সঙ্গী সাথীরা পর্যন্ত তার মন থেকে মুছে গেছে।

চোখ বুজলে সে শুধু দেখে একজনকে।

দেখে মন তার অধীর হয়ে উঠে। প্রাণপণে সে তাকে সরাবার চেষ্টা করে—কিন্তু পারে না।

দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়—আমার এ কি করলে তুমি প্রভু! আমার অজ্ঞাতে কাকে তুমি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করলে?

প্রতাপের দিকে সে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। নিজের হৃদয়ের পানে চেয়ে সে যেন আজ একান্ত রিক্ত ও সংকুচিত হয়ে পড়েছে। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত যে প্রতাপের সঙ্গে সে অকুণ্ঠ

ভাবে মিশেছে- আজ তার সঙ্গে কথা বলার সাহস ও তার নেই।

—চামেলী।

চামেলী ডাক শুনে চমকে উঠল। দেখল প্রতাপের দৃষ্টি তার মুখে নিবদ্ধ।

—আজ কদিন থেকে তোমার কি হয়েছে চামেলী? যেন সারা দিন তুমি আমায় কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাও। তাই নয়?

—কই, তেমন—

—বাধা দিও না। তোমার মধ্যে একটা উদাসীনতা বেশ স্পষ্ট।

—এদিকে অনেক কাজ পড়েছে, তাই—

—এ কথা বিশ্বাস হয় না।

—কেন?

—নতুন কোন কাজে ত তুমি আজ যাওনি। কি না কি ব্যাপার তা আমার কাছে লুকোবে চামেলী? আমায় জানাবে না কিছু?

তার কথায় যে অনেকটা আগ্রহ, অনেকখানি বেদনা জেগে উঠল —তা চামেলীর মনে আঘাত করল। সে মাথা নত করে রইল। তার ভয় হচ্ছিল কথা বলতে গেলেই গোপন আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়বে। সে ধরা পড়ে যাবে।

প্রতাপ অনেকক্ষণ নীরবে তার পানে চেয়ে বসে রইল। অতি সাবধানে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, যেন তা চামেলী শুনতে না পায়।

পরে ধীর স্বরে বললে—বুঝেছি, আমায় বিশ্বাস করে কোন কথাই তুমি বলতে চাও না। একটা বছর নিয়ত যাদের কাছে আছো, তাদের তুমি বিশ্বাস করে কোন কথা বলতে পারো না? এখনও তুমি আমাদের এমন পর ভাবো? কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার মত তোমার মঙ্গল জগতে ক'জন চায়, তা জানি না।

বজ্রাহতের মত চামেলী তাকাল প্রতাপের দিকে।

প্রতাপ বললে—কেন জান চামেলী।

—না।

—কারণ তুমি ক্ষণসঙ্গী মনে করলেও, আমি হয়ত চেয়েছিলাম মনে মনে তোমাকেই চিরসঙ্গিনী করতে। তাই আমার এই ব্যথা—

—না না, এ কথা বলবেন না—না না—

চামেলী মুখ চেপে কাঁদতে লাগল।

ধীর সংযত কণ্ঠে প্রতাপ বললে—কেউ বলবেনা চামেলী। তুমি যদি নিজেকে গরীব বিধবার স্ত্রী ভেবে আমায় অযোগ্য ভাব, আমি তা ভাবি না। তোমাকে স্ত্রী রূপে পেলে আমার জীবনকে আমি ধন্য বলে মনে করবো। কারণ আমার জীবনের কোথাও যদি এতটুকু অপূর্ণতা থাকে, তা পূর্ণ করতে পারো শুধু তুমিই। আমি কল্পনায় যে নারীর চিত্র এঁকেছি তা ঠিক তোমার মত। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস—আমার সারা অন্তর দিয়ে আমি তা জানতে পেরেছি। বল চামেলী তা কি মিথ্যা?

চামেলী থর থর করে কাঁপছিল।

বললে—আমায় ক্ষমা করুণ। আমি—

—ক্ষমা?

—হ্যাঁ।

বলে সে প্রতাপের পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

—চামেলী.....কিসে তুমি আযোগ্য? বল।

—না, আমি আপনার যোগ্য নই—

—কেন? বল—

—আমি যে ঘটনাটা জানতাম, এই দু' এক দিন হলো জেনেছি।

—কি ঘটনা?

—আমার পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। তারপর দুমাস পরে আমার স্বামী মারা যান। আমি তাই বিধবা। এ কথা আগে জানতাম না। জানলে এভাবে আপনার সঙ্গে মিশে—

উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদতে লাগল চামেলী।

প্রতাপের মনে হলো তার সামনে সারাটা জগৎ যেন উবে যাচ্ছে।

চামেলী বললে—সত্যি কথাই আপনাকে আমি বলব। কেন বলব জানেন? আজই যে আমার বলার দিন। আমি কদিন আগে পর্য্যন্ত তোমায় ভালবেসেছি। তোমার ধ্যান করেছি, তোমার কথা চিন্তা করে আনন্দ পেয়েছি। আর আজ? আজ যখন তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাই। তখনই তুমি শোনাতে এসে যে তুমি আমায় ভালোবাসো—তুমি আমায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চাও।

সে কাঁদতে লাগল আকুল ভাবে।

একটু পরে আবার বললে—তুমি আমার পথকে এভাবে দুর্গম করে তুলো না।

এবারে প্রতাপ তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলে।

বললে—ভগবানকে ধন্যবাদ, আজই এ কথা বলেছ। দুদিন আগে বললে হয়ত তোমাকে খুঁজে পেতাম না চামেলী। তোমাকে আমি ঘৃণা ও করেনি—বরং সব শুনে শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠেছে।

—কিন্তু তুমি কি বলতে চাও—

—আমি তোমাকে গ্রহণ করবো চামেলী। তোমার সব শুনলাম—তাও তোমাকে গ্রহণ করবো।

—তুমি আমাকে—

—হ্যাঁ, আমি সমাজকে জানাব যে তারা যাদের অভাগিনী বলে

দূরে ফেলে দিতে চায়, তাদের একজনকে আমি আমার ধর্ম-পত্নী করবো।

—কিন্তু মা—

—মাও এতে মানতে মত দেবেন। তাঁকে ও আমি ভাল করেই জানি।

প্রতাপের পা দুখানা জড়িয়ে ধরল চামেলী।

বললে কিন্তু এজন্য ভাল করে ভেবে দেখ। এ সাময়িক খেয়াল নয়। আমি বিধবা—

—সে কথা ত বললাম। পাঁচ বছরের মেয়ের বিয়ে হওয়া আর তার বৈধব্য। কিছুই আমি মানতে চাইনে চামেলী!

প্রতাপ হাসল।

তারপর বললে—চল্ এখুনি তোমার মার মত নেবো! আর বাড়ি গিয়ে আমার মার মত নিয়ে আসব।

॥ তেরো ॥

পথ চলতে চলতে চামেলী থমকে দাঁড়াল।

রমেশ একটা বাঁকের মুখে তার পথ রোধ করল। বললে—ও দিদি, দাঁড়াও। বাবা, তোমার আর দেখাই পাওয়া যায় না। আজ অনেক কষ্টে তবে তোমায় ধরেছি।

চামেলীর একখানা হাত সে দুই হাতে চেপে ধরল।

অন্য হাতে তার কপালে পতিত অবিন্যস্ত চুলগুলি সরিয়ে দিতে দিতে সস্নেহে চামেলী বললে—কেন বলো দেখি? হঠাৎ আজ আমাকে পথের মাঝখানে ধরার কারণটা ত আমি বুঝছিনে ভাই!

রমেশ উত্তর দিলে—হঠাৎ নয় দিদি, অনেকদিন তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, কখন তোমায় একা পাব। প্রায়ই তোমায় দেখতে পাই, কিন্তু কেউ না কেউ তোমার সঙ্গে থাকেই। প্রায়ই দেখি, প্রতাপদার সঙ্গে তুমি যাচ্ছ, কখনও দেখি কাজ নিয়ে ঘুরছো। দূর থেকেই তোমায় দেখে চলে যাই—কাছে এসে কথা বলা আর হয় না। আজ ভাগ্যবলে তোমায় পেয়েছি একা—একেবারে একা।

বলে সে পথের দু ধারে তাকায়। বলে—বিশ্বাস নেই, আবার কেন এখনি হয়তো এসে পড়বে। অসম্ভব তো নয়!

চামেলী হাসল।

বললে—কি এত জরুরী দরকার তা ত বুঝতে পারছিনে ভাই? অনেকদিন ধরে খুঁজছো। সঙ্গে লোক থাকলে সরে পড়ো—ব্যাপারটা ত বড়ো কম নয়। কিন্তু প্রতাপদা থাকলেই বা তোমার কথা বলতে ভয় হয় কেন—তা ত বুঝি না?

মুখ গম্ভীর করল রমেশ।

বললে—প্রতাপদা লোক ভাল দিদি, কিন্তু দাদু আর দিদিমণি বলে রেখেছেন, প্রতাপদার সঙ্গে মিশলে বা কথা বললে, আমাকে আর মাকে নাকি তাড়িয়ে দেবেন। যেন প্রতাপদার সামনে না যাই।

—ও বুঝেছি।

চামেলীর মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে।

একটু থেকে বলে—তাহলে তুমি ভাই প্রতাপদার সাম্‌নে এসো না। কে জানে মানুষ ত তিনি সুবিধের নন। হয়তো তোমায় আদর করে কোলে টেনেই নিলেন—শেষটায় বিপদে পড়বে।

রমেশ বললে—তোমার জন্যে সত্যি দিদি আমার মন বড় খারাপ হয়ে যায়। তুমি আর ও বাড়ি যাবে না দিদি?

চামেলী একটা নিশ্বাস ফেললে।

বললে—আর বোধ হয় যাওয়া হবে না ভাই। একবার যখন সে বাড়ি ছেড়ে এসেছি—

বলতে বলতে তার দৃষ্টি দূর পথের ওপর পড়ল।

দূরে দেখা গেল হরিদাস আর দাসু মোড়ল পথ দিয়ে আসছে।

চামেলী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বললে—তুমি ওদিক দিয়ে চট্ করে সরে পরো রমেশ, দাদু আসছেন। কে জানে তোমাকে দেখতে পেয়েছেন কি না!

রমেশের মুখ শুকিয়ে গেছিল। পিছনের বাগানটার দিকে এগোতে এগোতে বললে—না; দেখতে পায়নি। দাদুও ত চোখে কম দেখেন। চললাম দিদি, দু'একদিনের মধ্যে আমি তোমায় নতুন গাছের ফুল দিয়ে আসব—কুঁড়ি ধরেছে, ফুটলেই নিয়ে যাব।

বলতে বলতে সে ঝোপের আড়ালে লুকোল। হরিদাস দাসু মোড়ল নিকটে এলেন—তাঁরা পাশ কাটিয়ে চলে গেলে চামেলী ধীরপায়ে চলল। সাম্‌নে যাওয়ার চেয়ে পিছনে যাওয়াই ভালো—তাই সে সাম্‌নে গেল না।

নকুলের স্ত্রীর অসুখটা কাল থেকে বড় বেশি রকম বেড়ে গেছে।

প্রতাপ পার্শ্ববর্তী গ্রামে ডাক্তারের কাছে গেছে। চামেলীকে জানিয়ে গেছে, সে যেন রোগিনীর কাছে থাকে। নকুল জাতে জেলে।

ভদ্রসমাজে সে একেবারে অস্পৃশ্য। জেলে পাড়ার পথ দিয়ে ভদ্রলোক আসে খুবই কম—যদিও কেউ আসে, অতি সাবধানে শুচিতা বাঁচিয়ে চলে। নকুল তার জাতীয় ব্যবসা কোনদিনই গ্রহণ করেনি। চিরকাল সে চুরি ডাকাতি করে কাটিয়েছে। বহুবার জেল খেটেছে। যেখানেই চুরি ডাকাতি হোক না কেন পুলিশ তাকে এসে ধরেছে। অনেক সময় কিছু না করেও তাকে দণ্ড গ্রহণ করতে হয়েছে। প্রতাপ আসার সঙ্গে সঙ্গে নকুলের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। শাসন করে, পীড়ন করে বহুপ্রকারে শাস্তি দিয়েও তাকে কেউ শান্তশিষ্ট জীবন যাপনে অভ্যস্ত করতে পারে নি, প্রতাপের উপদেশে সে জীবনের গতিপথ পাল্‌টেছে। চামেলী নকুলের বাড়ি গিয়ে যখন রোগিনীর ভার নিল, তখন বকুল হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

সংসারে স্ত্রী ছাড়া তার কেউ নেই।

পাড়ায় মানুষ যারা আছে। সকলেই নিজেদের দুঃখের ধান্দায় নিজেরাই ব্যস্ত—সামান্য ক্ষণের জন্য দেখাশুনা করলেও রোগিনীর পরিচর্যার ভার কেউ নিতে পারেনি। বেঁচে থাকলে আজ নকুলের ঘরে থাকত তার উপযুক্ত সব ছেলে মেয়েরা। কিন্তু তার কেউ নেই। মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিল—বিয়ের পর দু'মাসও যায়নি। সে মারা গেছে।

বয়স আজ বেড়ে চলেছে—মাথার চুল পেকে উঠেছে। তবু নকুল আজও শক্তিশালী—সে আজও ভেঙে পড়েনি।

ভেঙে পড়েছে লখিয়ার মা—নকুলের স্ত্রী, সে প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছে। তার দৃষ্টি অতি ক্ষীণ, চলতে গেলে পা কাঁপে—দেখলেই বোঝা যায় দিন তার সংক্ষেপ হয়ে এসেছে।

চামেলী তার গায়ে হাত দিয়ে বুঝল জ্বর সমান ভাবেই রয়েছে। বুকে সর্দি ঘড় ঘড় করছে। আন্দাজেই বোঝা যায় তার নিউ-মোনিয়া হয়েছে। ডাক্তার এসে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত বোঝা যাবে না—তাই ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

দরজার কাছে বসে নকুল বলে চলেছিল তার সুদীর্ঘ দুঃখের ইতিবৃত্ত।

—বুঝলে মা লক্ষ্মী—আজ আমার পয়সা নেই কিনা, তাই কোন লোক আমার বাড়িতে এলো না। এই রোগীটাকে নিয়ে কিভাবে যে আমার দিন রাত কাটছে তা আর বলবার কথা নয়। আজ আমার পয়সা নেই তাই কেউ আমায় কেয়ার করে না। কি বলবো, বিষহারিয়ে আজ আমি বোকা হয়ে গেছি—কেউ আর আমাকে মানতে চায় না। আজ আমার এই অবস্থা করেছেন দাদাঠাকুর—না হলে, না হলে—বলতে বলতে তার দেহের মাংসপেশী গুলো যেন ফুলে উঠতে লাগলো। চামেলী রোগিণীর মাথায় বাতাস করতে করতে বললে—কেন দাদাঠাকুর তোমার কি করেছেন?

নকুল উত্তেজিত ভাবে বললে—কত বড় ক্ষতি যে তিনি আমার করেছেন তা কি বলব!

—সে কি?

—হ্যাঁ, মা লক্ষ্মী। জীবনে পাপ-পুণ্য-ধর্ম-অধর্ম কোনও দিন জানতে চাইনি। সেই জ্ঞান এই দাদাঠাকুর দিলেন। একদিন এই নকুল সর্দারের লাঠির নামে গোটা অঞ্চলটা কেঁপেছে—আর আজ আমি—আমায় কেউ চিনতেও চায় না। আজ পয়সার অভাবে লখিয়ার মার চিকিৎসা করতে পারছি না। আর আমি একদিন গরীব দুঃখীদের কত টাকা পয়সা দু'হাতে বিলিয়ে দিয়েছি।

চামেলী বললে—কিন্তু সে জীবনটা কি ভাল নকুল?

নকুল তার চোখ তুলে চামেলীর পানে তাকাল।

বললে—না, মা লক্ষ্মী—তা নয় জানি। সত্যি আজ বিচার করে বুঝতে পারি, সেদিন কি জঘন্য না ছিলাম আমি।

—তবে ?

—সত্যি সে দিনের কথা ভাবতেও আমি আজ শিউরে উঠি মা লক্ষ্মী। আমি আজ বেঁচে গেছি।

—সেটা বুঝেছ ত ?

—হ্যাঁ। দাদাঠাকুরকে রোখের মাথায় যাই বলি না কেন, তিনি আমায় নরক থেকে টেনে এনে উদ্ধার করেছেন। তাই তিনি আমার গুরু। সে দুহাত কপালে ঠেকায়। চামেলীর মনেও যেন একটা কিসের আলোড়ন জাগে। সে বলে—লোকের জন্যে বা চিকিৎসার জন্যে তোমাকে আর ভাবতে হবে না নকুল।

—তা জানি মা—

—লখিয়ার মার অসুখ শুনেই তোমার দাদাঠাকুর গেছেন ডাক্তার ডাকতে। আর তিনিই আমাকে বলে গেছেন এখানে আসতে, তা না হলে আমি কি করে জানবো বল।

নকুল চুপ করে রইল।

চামেলী বললে - তোমার যা কাজকর্ম তুমি করোগে—রোগিনীর ভার আমাদের। নিতান্তই আকস্মিকভাবে নকুলের দুটি চোখ ঠেলে ঝর ঝর করে খানিকটা জল গড়িয়ে পড়ে।

সে তা আত্মগোপন করার জন্যেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

॥ চৌদ্দ ॥

গ্রামে দুটি দলের সৃষ্টি হলো। যারা একান্ত উদারভাবে প্রতাপের মতের সমর্থন করলে, তারা দেশের আশা ভরসা তরুণ দল।

এরা সমাজের উন্নতি করতে চায়—কাজ করতে চায়। প্রবীণের দল ভিন্ন দলে জোট বেঁধেছেন। তাঁরা এই তরুণ দলকে যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন।

এই দলের মধ্যে প্রবীণচিত্ত বুদ্ধি ও গাম্ভীর্য নিয়ে যেকটি তরুণ ঢুকেছিল, তাদের মধ্যে দুর্ভাগিনী মেয়ে অনিমার স্বামী মহেশও একজন! সে কেন প্রবীণদের দলে গেল তার কারণ ছিল।

আজ একমাস হলো, আত্মহত্যা করে অনিমা সংসারের অসহ্য জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। হরিদাসের বাড়িতে চামেলী থাকতে সে চামেলীর সঙ্গে দু'একটা কথা বলে নিজের দুঃসহ যাতনা লঘু করতে পারত। ইদানীং মহেশের অত্যাচার খুবই বেড়েছিল। অনিমার নিজেরস্বাস্থ্যও একেবারে নষ্ট হয়ে গেছিল। আগে যতখানি সহ্য করার ক্ষমতা ছিল, অসুখে ভুগে সে ক্ষমতা লোপ পেয়েছে।

এজন্যই একদিন রাতে মহেশ যখন মিথ্যা তাকে গালি দিয়ে, পদাঘাত করে বাড়ির বের করে দিলে, তখন সে আর সহ্য করতে পারলে না। তার ফলে পরদিন সকালে অনিমার রোগশীর্ণ প্রাণশূন্য দেহটাকে সেই বাড়ির বাগানে এক গাছের ডালে ঝুলতে দেখা গেল। এই তরুণ দল তাই মহেশকে ঘৃণা করত। তাকে স্পষ্ট ভাষায় নারী হত্যাকারী বলে তারা উল্লেখ করত। সেদিন বাজারে এ বিষয় নিয়ে মহেশের সঙ্গে একজনের হাতাহাতি অবধি হয়ে গেল। প্রতাপ না থাকলে সেদিন স্ত্রী হত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একখানি অংগ মহেশকে

রেখে আসতে হতো। কালে কালে কি সব ঘটছে—প্রবীণরা অবাক হয়ে তাই দেখেন। দিন দিন সবই যেন বদলে যাচ্ছে। বরাবর যা চলে এসেছে, আজ এরা তা বিনা বিচারে মানতে চায় না। কোন কাজে কোন ধর্মের দোহাই দিলে ছোকরারা তা হেসে উড়িয়ে দেয়।

কেউ একটা গার্হিত কাজ করলে, সমাজ যদি বিচারের কথা তোলে তবে তারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ চায়—পুঁথিগত প্রমাণ তারা মানতে রাজী নয়। শুধু ছেলেদের মধ্যে নয়—মেয়েদের মধ্যেও যেন অসন্তোষ ক্রমে দানা বেঁধে উঠছিল।

বিশেষ করে অনিমার মৃত্যুর পর সব মেয়ের মধ্যেই যেন কেমন চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে।

নিজেদের মতে যেটা সত্যি তাই তারা মানতে চায়—কোন গ্রাম্য নিয়ম মানতে চায় না।

এইসব তরুণ আর মেয়েদের উদ্যোগে গ্রামে একটি ছোট দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ে উঠেছিল। এরই মধ্যে ওদের অক্লান্ত পরিশ্রমে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে—চামেলী তার শিক্ষয়িত্রী।

ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গ্রামের মেয়েরা বই হাতে নিয়ে পড়তে যায়—প্রবীণদের দল যেন হাঁ করে থাকে।

বৃদ্ধেরা তাঁদের চিরকালের হরিদাসের চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় জড়ো হয়। তাদের মধ্যেও রীতিমত আলোচনা শুরু হয়। তারা এইসব নানা অচিন্তনীয় ব্যাপার দেখে যেন বিহ্বল হয়ে যান। কেউ বলেন—ঘোর অনাচার।

কেউ বলেন—সর্বনেশে ব্যাপার!

দাসু মোড়ল বলেন—কে আনল এই অনাচারের বন্যা বলুন?

হরিদাস রেগে ওঠে—মেয়েরা লেখা পড়া শিখলে রান্না কে করবে! ছেলেমানুষ করবে কে? ছি ছি, দেশটাকে ওরা অধঃপাতে দিলে।

—আর এরা স্বেচ্ছাচারীও হবে—

—হবে কি, হচ্ছে—দেখ না চেয়ে।

—সব পটের বিবি সাজছে।

হারাণ চাটুয্যে বললেন—আর দেশে হতে বাকী থাকল কি বল! এরপর হয়ত দেখবে কতকগুলো ছোঁড়া মিলে মঞ্জুর বিয়ে দিলে বলে—হরিদাস বললে—আর ছোঁড়াদের দোষ কি? বুড়ো শিবশংকর পর্য্যন্ত ওদের দলে।

—যাক্‌গে ভায়া, নিজেরা পাপ করছে, ফলত তারাই সব ভুগবে। ছেলে নাতিরা সয়ে যাচ্ছে, দুঃখ হয়, তাই বলি। তা না হলে আর—হরিহে তোমারই ইচ্ছা!

হরিদাস বললেন—এদিকে আর সব কথা শুনছ!

—কি?

—বিধবা বিয়ে!

—কই না ত!

—আরে আমার সেই কুলাঙ্গার নাতনী—চামেলী। ও বিধবা জান ত?

—হ্যাঁ।

—শুনলাম ওর সঙ্গে নাকি ছেলের দল প্রতাপের বিয়ে দেবে স্থির করেছে।

—সেকি কথা!

—হা ভগবান, রক্ষে করো। দেশটাকে এই ভাবে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে!

দাসু খুড়ো বললেন—এ ব্যাভিচার।

হারাণ বাবু বললেন—এ খিরিষ্টাণী। যা কোনও দিন এদেশে হয় না। সর্বনাশ—দেশটা তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন পথ নেই।

হরিদাস বললেন—এখন কি করা উচিত বলুন।

—উচিত এক্ষুনি হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে এগিয়ে যাওয়া।

এভাবে হিন্দুরা ধ্বংস হবে তা দেখা যায় না—পরম পবিত্র বিধবা তাদের আবার বিয়ে। শোনাও পাপ।

—তবে চলুন আমরা এ বিয়ে বন্ধের চেষ্টা করি।

—নিশ্চয়ই।

হরিদাস বললেন—প্রতাপের মা আদর্শ বিধবা। সতেরো বছরে প্রতাপকে নিয়ে বিধবা হয়েছেন। চিরদিন তাঁর ব্রহ্মচর্য অটুট। চলুন তাঁকে গিয়ে আমরা সবাই মিলে ধরি। তিনি নিশ্চয়ই পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে এমন সমাজ বহির্ভূত কাজ করতে রাজী হতে পারেন না।

—ঠিক কথা—

—ভাল প্রস্তাব—

—সত্যিকারের ধর্মের কাজ হবে এটা করলে। সকলে সমর্থন করলে। দাসু মোড়ল বললে—চলুন সবাই মিলে তাঁকে বলি। আরে প্রতাপের মত হীরের টুকরো ছেলের আবার পাত্রের অভাব কি। ভট্‌চার্য মশায়ের নাতনী, গাঙ্গুলী মশায়ের সুন্দরী ভাগনী, ঘোষাল মশায়ের সুন্দরী কন্যা—কত পাত্রী। যে পাবে এমন ছেলে মাথায় করে নেবে।

—ঠিক কথা—

—না, প্রতাপের মত ছেলের সঙ্গে বিধবার বিবাহে আমরা কেউ মত দিতে পারি না।

* * *

দল বেঁধে সকলে প্রতাপের মায়ের কাছে গেলেন। তাঁদের সকলের বক্তব্য যখন শেষ হলো, কিরণময়ী একটু হাসলেন মাত্র।

প্রধান নেতা হরিদাস উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। চোখ মুখ লাল করে বললেন—হাসলে যে মা? এতে হাসির কথা তুমি কি পেলে? তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, সাধ্বী, সতী, পুণ্যবতী—আজন্ম ব্রহ্মচর্য পালন করে এসেছো। তুমি ধর্ম গর্হিত বিধবা বিয়ের

অনুমোদন করবে মা? এই যে বিধবার বিয়ে—যা তোমরা দিবে বলে এগিয়েছো, তা কখনো সমাজে চলেছে?

মিষ্ট স্বরে কিরণময়ী বললেন—হ্যাঁ বাবা, এককালে চলেছিল। বিধবার বিয়ে অবশ্য—কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নয়। স্থান কাল ও পাত্র বিবেচনায় অনেক জায়গায় এমন বিয়ে হয়েছে। যারা বড় হয়েছে, স্বামীর সম্বন্ধে ধারণা করতে পেরেছে বাবা, তাদের বিয়ের নামে স্বেচ্ছাচারিতার অনুমোদন আমি করি না। কিন্তু যারা নেহাৎ ছোট মেয়ে। যাদের অভিভাবকরা আপনার ছেলের মতোই খেয়ালের মতো এতটুকু বেলায় বিয়ে দিয়ে ফেলে—তাদের বিধবা হওয়ার মূল্য কি?

একটু থেমে কিরণময়ী বললেন—স্বামীকে যে চেনে না, জানে না, মনে নেই, সেই ছোট মেয়েটি যখন বড়ো হলো, তাকে বিধবা বলা কি হৃদয়হীনতা নয়? আপনি অনেক দেখেছেন। পাঁচ বছরের মেয়ের বিয়ে, এতো পুতুল খেলার মতো। ধর্মকে রক্ষা করতে, সমাজকে রক্ষা করতে, অধর্ম থেকে রক্ষা পেতে সামাজিক নিয়ম। কিন্তু চিন্তা করুন ত এর মধ্যে কোনও অধর্ম আছে কি? আমার স্বামী কেমন ছিলেন তা আমি জানি, তার পবিত্র স্মৃতি নিয়ে আমি জীবন কাটাচ্ছি। সারা জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করছি। কিন্তু পাঁচ বছরের চামেলী সব কথা ভুলে গেছে—কোনও কথাই আজ তার মনে নেই! আমি অনেক ভেবে, অনেক চিন্তা করে তবেই চামেলীকে আমার পুত্রবধূ করব স্থির করেছি।

গ্রামের প্রধানদের মুখ আঁধার হয়ে গেল। কিরণময়ীর কথা শুনে তাঁরা বেরিয়ে গেলেন।

সবার শেষে হরিদাস বের হচ্ছিলেন। কিরণময়ী তাঁকে ডেকে বললেন—একটু দাঁড়ান বাবা, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। ফিরে দাঁড়ালেন হরিদাস। বললেন—আমার সঙ্গে কি কথা মা?

কিরণময়ী তাঁকে একটা আসন পেতে বসতে দিলেন। তারপর বললেন—বাবা, আমরা কেউ জানতাম না চামেলী বিধবা, চামেলী নিজেও জানত না। তার স্বর্গত বাবা এ কথা চেপে রেখে ছিলেন। তাঁর পথ ধরে মঞ্জুও এ কথা চেপে রেখেছিল। মঞ্জু এখনো চামেলীর বিয়েতে মত দেয়নি। তবে আমি আর আমার ছেলে এ বিয়েতে রাজী। ধর্মের জন্যেই সমাজ, এ কথা আপনিও মানেন।

একটু থেমে বললেন—আজ যদি আপনার ছেলে কানাই বেঁচে থাকতো, সেও এগিয়ে আসতো মেয়ের এ বিয়েতে আশীর্ব্বাদ করার জন্যে। আমি চামেলীকে ডাকছি—এসব ব্যাপার দেখে সে একেবারে ভেঙে পড়েছে, জিদ ধরেছে বিয়ে করবে না। এখন যদি আপনার আশীর্ব্বাদ পায়, সে জানবে, তার এ বিয়ে অবৈধ নয়। বসুন, আমি তাকে নিয়ে আসি।

হরিদাস বসলেন। কিরণময়ী বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরে তিনি ফিরে এলেন। চামেলীর হাত ধরে টানতে টানতে তাকে হরিদাসের পাশে বসিয়ে দিলেন। বললেন—আশীর্বাদ ভিক্ষা করে নাও মা, এ আশীর্বাদের তুল্য আর কিছু নেই। বাবা, আজ আপনার ছেলে কানাইয়ের কথা মনে করুন। আপনি তাকে যেমন ভালবাসতেন, সে তেমনি করে ভালবাসতো একে। এর দেহ, মন সবই কানাইয়ের দান। এর জ্ঞান বিদ্যা সবই আপনার কানাইয়ের। দেখুন বাবা, এর দিকে তাকান একবার।

—মা!

বৃদ্ধের গোপন ব্যথা বাঁধা মানল না। উচ্ছ্বসিত অশ্রু ঝরে পড়ল। তিনি বিহ্বল। অশ্রুপূর্ণ লোচন। কিরণময়ীকে বললেন—আর বলো না, যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে। আজীবন ভুল পথ ধরে চলেছি। কেবল ভুলই করে আসছি। আজ প্রাণ খুলে চামেলীকে আশীর্বাদ করছি। যাতে ভুলের কতক প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে।

অশ্রুমুখী চামেলী—সে হরিদাসের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলে। তাকে কোলে টেনে নিলেন হরিদাস।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন—তোর ঠাকুরদার সব দোষ ক্ষমা কর দিদিভাই—বুড়ো হয়েছি, মাথার ঠিক নেই, যে যা বলছে তাই শুনে বিশ্বাস করে যাচ্ছি। তোকে আর বউমাকে যে কত রকমের নির্যাতন করেছি, তার ঠিক নেই। আজ আমি—

কথা বলতে বলতে আটকে গেলেন। একটু থেমে বললেন—আজ প্রাণ খুলে তোকে আশীর্বাদ করছি ভাই, তুই সুখী হ। দেশের ও দশের উপকার যেমন করছিস তেমনি কর। দুজনের শক্তি তোদের একত্র হয়ে দেশের শুভকাজ করুক। দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল মঞ্জু। সে চোখের জল চাপতে পারলে না—চোখে আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল।

॥ পনরো ॥

খুব গোপনে রমেশ ফুলগুলো নিয়ে বের হচ্ছিল বাড়ি থেকে। ভোরবেলা বাগানে গিয়ে সে কয়েকগুচ্ছ রজনীগন্ধা সংগ্রহ করেছে। কয়েকটি স্থলপদ্ম ফুটেছিল—রজনীগন্ধার গুচ্ছের মাঝে মাঝে পরিপাটি ভাবে সেগুলি বসিয়ে চমৎকার একটি তোড়া সে তৈরী করেছে। এই তোড়াটি সে দেবে দিদির হাতে।

এটা পেয়ে দিদির মুখ কতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তা ভেবেও তার আনন্দ হচ্ছিল খুব। দরজার সাম্‌নেই দেখা হলো সরমা দেবীর সঙ্গে। খুব ভোরে স্নান শেষ করে তিনি বাড়ি ফিরে আসছিলেন। তিনি রাগে ফেটে পড়লেন রমেশকে দেখে।

বললেন—করেছিস কিরে? একেবারে সর্বনাশ করেছিস দেখছি। গাছের সব ফুলগুলোর দফা শেষ করেছিস্! পুজোর জন্যে একটা ফুলও তুই রাখিসনি।

—সব ফুল ত তুলিনি।

—না তুলিসনি! বলি আমার মাথা খেয়ে, এইসব ফুল দিয়ে তোড়া বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোন্ চুলোয়? কাকে দিতে চলেছ শুনি, ঠাকুর পুজোর ফুল, কোন্ কুকুর ভোগে লাগাবে শুনি!

গোলমাল শুনে ছায়া ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

রমেশ একেবারে নীরব হয়ে গেছে। সে শুধু চুপচাপ সব গালাগালি সহ্য করে যাচ্ছে। ছায়া তার হাত থেকে ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

রমেশ একবার বাধা দিতে গেছিল, একবার মাত্র কি যেন কথা বলতে গেছিল।

কিন্তু তার ক্রুদ্ধ জননী তার পিঠে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বললে—আবার কথা বলতে আসছিস! লজ্জা করে না তোর? এই তোড়াটা গাঁথা হয়েছে কার জন্যে তা বুঝছো না পিসীমা? এ তোড়া নিয়ে চলেছে আপনাদের প্রতাপের বাড়িতে—ভেট চলেছে।

একটু থেমে একবার দম নিয়ে ছায়া আবার বললে—আপনি ত শাসন করতে দেবেন না—এদিকে আদর পেয়ে পেয়ে ছেলে যে বাঁদর হয়ে যাচ্ছে। তা তো বুঝবেন না। এতো বাগানের ফুল যাচ্ছে, তা ছাড়া ঘরের জিনিসপত্র যাচ্ছে কিনা—

—মা! আহত বালক চীৎকার করে উঠল। বললে—তুমি একথা বলোনা। ফুল আমি কোনদিন নিয়ে যাই নি। আজই সবে প্রথম নিয়ে যাচ্ছিলাম—

বলতে বলতে অভিমানে দুঃখে তার দুটি চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল!

এক ঘণ্টা ধরে পরিশ্রম করে সে তোড়াটি তৈরী করেছিল।

সরমা দেবী হয়তো বেদনা পেয়েছিলেন। বললেন—তাই বলে ফুলগুলোকে অমন ভাবে ফেলে দেওয়া, দুম্‌দাম করে মারা

তোমার উচিত হয়নি বউমা। রাগ হলে তুমি বাছা নিজেকে সাম্‌লাতে পারো না—এই তোমার বিশেষ দোষ।

ততক্ষণে দুই হাতে চোখ মুছতে মুছতে রমেশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

* * *

পথে দেখা হলো প্রতাপের সঙ্গে।

—এই যে মাষ্টার রমেশ। কোথায় যাওয়া হচ্ছে পড়াশুনো ছেড়ে?

তারপর কোনও উত্তর না পেয়ে বললে—আর তোমার চোখ মুখই বা এ রকম দেখাচ্ছে কেন? রমেশ সংকুচিত হয়ে উঠল।

বললে—কই, কিছু হয়নি ত? আমি তো বেশ ভালই আছি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন দাদা?

সে যে কোনো কথা গোপন করছে, তা প্রতাপ বুঝেছে। কিন্তু সে কথা সে জানাতে চাইলো না।

বললে—যাচ্ছি আবার ভট্‌চার্য বাড়ি, সেখানে আবার গোলমাল বেধেছে যে। তোমায় একখানা পত্র দিচ্ছি রমেশ ভাই, এক ছুটে এখানা আমার মাকে দিয়ে আসতে পারো যদি ত বড় ভাল হয়।

রমেশ এক কথায় রাজী হয়ে গেল। বললে—দিন, দিয়ে আসছি। আর সেখানে গিয়ে কি বলতে হবে তাও বলে দিন।

পকেট থেকে একখানা নোটবুক বের করে তারই এক পাতা ছিঁড়ে খস্‌খস্‌ করে কি লিখতে লিখতে প্রতাপ বললে—না মুখে তোমায় কিছু বলতে হবে না, কেবল এই পত্রখানা দিয়ে এলেই মা সব বুঝতে পারবেন। পত্র নিয়ে রমেশ চলে গেল। অগ্রসর হবার মুখে সরমা দেবীর কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এলো।

—বলি প্রতাপ, এটা কি তোমার উচিত কাজ হচ্ছে। একটা দুধের ছেলে, তাকে এমনি করে নাচানো কি তোমার পক্ষে ভালো হলো বাবা? এদের মা মেয়েকে ত টেনে তুলেছ নিজের বাড়িতে।

বুঝলুম সেখানে না হয় তোমার নিজের স্বার্থ আছে। কিন্তু এই কচি বাচ্চাটার মাথা কেন খাচ্ছো শুনি।

থতমত খেয়ে প্রতাপ দাঁড়িয়ে পড়ল।

সরমা দেবীর কথা শেষ হলে সে বললে—আপনি কি বলছেন তাতো বুঝতে পারলাম না দিদিমা। কার মাথা খাচ্ছি। সেটা বলুন একবার। তবে তো বুঝব—তা না হলে ধারণা করবো কি করে?

সরমা দেবী রাগতভাবে বললেন—এই ছোলেটাকে উস্‌কে দিয়ে বাগান থেকে ফুল নিয়ে যাওয়া হয়, ঘর থেকেও দরকার মত জিনিষ পত্র কিছু—

প্রতাপ বাধা দিলে।

বললে—এসব আপনি কি বলছেন দিদিমা? আপনি যে এসব কথা ভাবতে পারেন, বলতে পারেন, আমি ত ভাবতেও পারিনি। আপনার কাছে আরও কথা বলতে পারতাম, কিন্তু সময় নেই বলেই শুধু জানিয়ে যাচ্ছি, আপনি একেবারে ভয়ানক ভুল ধারণা করেছেন।

—ভুল?

—হ্যাঁ। রমেশের সঙ্গে আজই আমার দেখা হয়েছে মাত্র—আপনি বরং জিজ্ঞাসা করে দেখবেন ওকে।

বলে সে পেছন ফিরে—হন্ হন্ করে পথ চলতে লাগল—পিছন ফিরে একবারও চাইল না। তার বিশেষ কাজ ছিল। তার বিশেষ পরিচিত সুজিতের পিতা রণজিৎ ভট্টাচার্য বহুদিন বিদেশে কাটিয়ে, বর্তমানে কয়েক বছর হলো দেশে বাস করছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র সুজিত। সে বিলেতে গেছিল—ডাক্তারী পাশ করে ফিরছে। গ্রামে এরই মধ্যে গুজব রটে গেছে যে সুজিত বিলেতে মেম বিয়ে করে খ্রীশ্চান হয়েছে। গ্রাম্য সমাজপতিরা সব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। একদিকে প্রতাপও চামেলীকে নিয়ে তাঁরা বিব্রত হয়ে আছেন,

আবার আর একদিকে রণজিৎ ভট্টাচার্যের ছেলে সুজিতকে নিয়ে তাঁরা কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কিন্তু এখানে বিশেষ জোর চলে না। তার কারণ রণজিৎ ভট্টাচার্য জমিদার—তাঁর জমিতে অনেকেই বাস করেন। উদার হৃদয় রণজিৎবাবু কত সময় খাজনা দেন না, এরকম প্রজাকে মাপ করেছেন। তাঁর কোলকাতার বাড়িতে ব্রাহ্মণরা গেলে অনেকেই কিছু লাভ করেন। তিন বছর আগে রণজিৎ ভট্টাচার্যের স্ত্রী সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপন করেন। এই ব্রত উদ্‌যাপনের দিন চৌদ্দখানা গ্রাম নিয়ে যে বিরাট সমাজ—তার সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছিল, ভূরিভোজে তৃপ্ত হয়ে প্রত্যেকে নতুন কাপড় পাদুকা সহ প্রণামী দুই টাকা টাঁকস্থ করে প্রচুর আশীর্বাদ করে ফিরেছেন, আজও জমিদার বাড়ির সিধে অনেকেই পান।

তা ছাড় দেশের যে কোন কাজেই রণজিৎ ভট্টাচার্য শুধু হাতে টাকা দান করেন। তিনি নিজে কটি পথ বানিয়েছেন, স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রচুর সাহায্য করেন—হাসপাতালও একটা করার ইচ্ছা আছে। এরকম লোকের মুখের উপরে কে কথা বলবে? তবে প্রকাশ্যে না বললেও পেছনে যে তাঁর বিরুদ্ধে বহু আলোচনা হচ্ছে তা প্রতাপ জানে। সম্প্রতি সুজিত এখানে এসেছে। আজই সকালে গ্রামের পুরোহিত ন্যায়রত্ন মশাই তাঁর নিত্য নারায়ণ পূজো করে এসেছেন। গৃহিণী পরিচয় দিয়েছেন—ন্যায়রত্ন মশাই, এই আমার ছেলে সুজিত। সম্প্রতি কোলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে যে ভালো কাজ পেয়েছে। তাই কাজে যাবার আগে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সাহেবী পোষাক পরা দীর্ঘদেহী সুজিতকে দেখে ন্যায়রত্ন মশায়ের ত চক্ষু স্থির। মা বলেছিলেন—প্রণাম কর সুজিত, ইনি আমাদের কুলের চির পুরোহিত। প্রণাম করে আশীর্বাদ নে। ইউরোপ থেকে সদ্য প্রত্যাগত সুজিত—তার রক্ত এখন গরম।

একমাত্র পিতামাতা ছাড়া সে কাউকে প্রণাম করে না—তা সে

গুরুই হোক বা পুরোহিতই হোক। সে হাতদুটো কেবল কপালে ঠেকাল। শশব্যস্তে ন্যায়রত্ন মশায় বলেছিলেন—এই হয়েছে, ঢের হয়েছে। থাক্ বাবাজী, ওই হয়েছে—কোনক্রমে পূজোটা সেরে ন্যায়রত্ন মশাই ক্ষিপ্র হাতে নামাবলীতে নৈবেদ্য বেঁধে বাড়ির বাইরে এসে নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন। এই মানুষের সম্বন্ধে কোনও কথা বলতে গেলে যে মার খেতেও হতে পারে, তা তিনি জানেন। তাই তিনি গ্রামে কথাটা বলেছেন, কিন্তু কোনও আন্দোলন করেননি। সবাই জানে এ কঠিন ঠাঁই। তাই তারা এ নিয়ে নানান কথা বলে বেড়াতে লাগল, কিন্তু প্রকাশ্যে কোনও বিরুদ্ধ কথা বলতে সাহস পেলো না। কথাটা এলো প্রতাপের কানে।

সে খুশী হলো—সে চলল তক্ষুণি সুজিতের সঙ্গে দেখা করতে। সুজিত তার বহু পুরোনো বন্ধু। সে গ্রামে আছে—এসেছে মানুষ হয়ে।

সে তাই চলেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে।

॥ ষোল ॥

এই বিবাহ ব্যাপারে হরিদাসকে যোগ দিতে দেখে গ্রামের প্রাচীন ও তরুণ দুটি দলই অবাক হয়ে গেল।

তরুণের দল উচ্ছ্বসিত।

মহা আনন্দে তারা যেন উদ্বেগ।

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে তারা বললে—জয় ভারত-মাতা কি জয়। বন্দে মাতরম্। জয় হিন্দ।

বলে তারা মহানন্দে চীৎকার করে উঠল।

তারপর তারা অস্পৃশ্য, স্পৃশ্য সব জাতিকে বিবাহে নিমন্ত্রণ করলো সকলকেই সমানভাবে অভ্যর্থনা করলে।

এই বিবাহে ধোপা, নাপিত, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সকলেই নিমন্ত্রিত হলো।

প্রবীণের দল আশে-পাশেই ঘুরছিলেন। তাঁরা দু একজনকে বুঝিয়ে এই বিবাহে যাওয়া থেকে নিবৃত করতে চেষ্টাও করে ছিলেন।

কিন্তু তাঁরা কৃতকার্য হতে পারলেন না।

সেদিন কে কার কথা শোনে?

আনন্দ মিলনের ধারা যেন আজ স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে পৃথিবীতে।

ছোট বড় সবাই আজ সেই ধারায় স্নান করে নিতে চায়।

তাই পুরাতনকে আজ কেউ আঁকড়ে ধরে থাকবে না।

সন্ধ্যার একটু পরে আহারাদির ব্যাপার আরম্ভ হলো—এবং তা নির্বিবাদে শেষ হয়ে গেল।

তারপর বিবাহ। হরিদাস নিজে কর্মকর্তা হয়ে প্রতাপের হাতে চামেলীকে সম্প্রদান করলেন। শত শত কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সে দৃশ্য দেখতে দেখতে বৃদ্ধ হরিদাসের কঠোর প্রাণ গলে গেল। তাঁর দুটি চোখে নামল মনের ধারা।

সত্যিই তো—এ সজীবতা মরা গ্রামের বুকে কে এনে দিয়েছে?

এমন অসীম শক্তি কার যে এম্‌নি করে ছোট বড়র সব ভেদাভেদ মুছে গেল?

এইসব যুবক বরাবর নিশ্চেষ্ট থাকত—তারা যাত্রা করত—তারা তাস পাশা খেলত।

কার অসীম শক্তির কণামাত্র লাভ করে এরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে?

এরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বন জঙ্গল সাফ করছে। পুকুরের সব সংস্কার করছে, দেশের রোগীদের সেবা করছে। এই অসীম মহা-প্রাণতায় এদের অনুপ্রাণিত করলে কে?

দেশ কি ছিল—আজ কি হয়েছে। সত্যিই আজ স্বাধীন ভারতের একটি গ্রাম বলে এ গ্রামের পরিচয় দেওয়া চলে।

আর এই বিবাহ!

এই বিবাহ দেশের অনিষ্ট ত হয়নি—বরং তাহা মঙ্গল সাধিত হয়েছে।

যাদের ঘৃণা করে দূরে রেখে এ সমাজ তাদের হৃদয়ে ঈর্ষার আগুন জ্বেলে দিয়েছিল, আজ ছোঁওয়ার বিচার না করে, তাদের পাশে টেনে নিয়ে অনেকগুলি মৃত প্রাণকে এরা সঞ্জীবিত করে তুলেছে!

এ এক অভিনব দৃশ্য—মহা আনন্দময় মিলন!

বিবাহ শেষে দম্পতিকে আশীর্বাদ করে বাড়ি যাবার জন্যে পথে বের হতেই প্রবীণের দল হরিদাসকে ঘিরে ধরল।

আপনি এ কাজ করলেন!

—আপনি শুধু সমর্থনই করেননি কর্মকর্তা হয়ে বসলেন এই কাজে! এত বড় জ্ঞানী লোক আপনি, আপনার মত শাস্ত্রজ্ঞান কজনের আছে? আর আপনি দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিলেন?

হরিদাস শান্ত স্বরে বললেন—না, আমি শাস্ত্র বহির্ভূত কাজ করিনি।

—করেননি?

—না, যদি এ বিয়ে দেওয়া হতো তাহলে পাপের স্রোতই বেড়ে বেড়ে চলত—শাস্ত্রের মর্যাদা এতটুকুও থাকতনা, তাই অনেক ভেবেই আমি এ বিয়ের কর্মকর্তা হয়েছি। আমি বলছি, বিশ্বাস করো, এ বিয়ে অবৈধ নয়।

—কি বলছেন আপনি?

—ঠিকই বলছি, এ শাস্ত্র সম্মত বিয়ে। এ বিয়ে তোমরা অনায়াসে মেনে নিতে পারো।

দাসু মোড়ল কপালে করাঘাত করলেন।

আর একজন বললেন—না, জাত জন্ম এরা আর কিছু রাখলে না। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আপনি প্রবীণ বুদ্ধিমান লোক হয়ে শেষে এদের দলে যোগ দিলেন। শুনছি ধোপা, নাপিত, বামুন, কায়েত সব এক সঙ্গে বসে খেয়েছে?

গম্ভীর স্বরে হরিদাস বললেন—ভগবানকে ধন্যবাদ যে আজকে এই মধুর মিলন দৃশ্য আমরা দেখতে পেলাম। আজ চিরপুরাতন কথাই নতুন করে আমাদের শোনাতে যুগের গুরু দরজায় এসেছেন। সাম্যের বার্তা তিনিই আমাদের দিয়েছেন। মহৎ যে, সে তার কাজের দ্বারাই ব্যক্ত হবে। জাতি দ্বারা নয়।

—তার মানে?

—মানে শাস্ত্রেই বলেছে—'চণ্ডালোপি দ্বিজোশ্রেষ্ঠ হরিভক্ত নারায়ণঃ।' ব্রাহ্মণ হয়েও নীচ কাজ করলে সে সত্যিই নীচ। আর নীচ কুলে জন্মে সৎকাজ করলে ধর্মাচরণ করলে সে সবচেয়ে উঁচু। বর্ণ লোকের কর্মের গুণ—বংশগত গুণ বলে ধরে রাখা উচিত নয়।

একটু থেমে বললেন—জীবনের শেষে এসে আজ যে এই সহজ সত্য জ্ঞান লাভ করতে পেরেছি এর জন্যে ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিচ্ছি। মিথ্যা নিয়েই জীবন কাটালাম—এতদিন গেল, আজ মনে হচ্ছে সত্য যে কোথায়, নারায়ণ যে কোথায় এতদিনে জানতেন পেরেছি। আর তা তিনিই স্বয়ং বোধ হয় আমাকে জানালেন।

সরমা দেবী সেদিন নাতনীর বিয়েতে কোমরে কাপড় জড়িয়ে অপটু দেহ নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন—প্রতাপের কাণও তিনি কয়েকবার ধরেছিলেন।

রমেশ এক দণ্ডের জন্যেও প্রতাপের পাশ ত্যাগ করেনি। রমেশের মা ছায়া, সান্নার ভার নিয়েছেন—তার মধ্য থেকেও ছুটি করে এসে সে প্রতাপকে ঠাট্টা তামাসা করে যেতে ছাড়েনি।

আর রমেশ?

তার কথা না বললেও চলে। সে ফিরে পেয়েছে তার দিদিকে। এসেছেন প্রতিপত্ত—সে তাদের কাছ ছাড়া হয়নি।

প্রতাপের বন্ধু সুজিত

একদিন একত্রে তারা স্কুল কলেজে পড়েছে। তারপর আই এস্‌সি পাশ করে সুজিত গেল ডাক্তারী পড়তে। আর প্রতাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি ডিগ্রী নিয়ে এসেছে দেশের সেবা করতে।

সুজিত বাড়িতে এসেই প্রতাপকে জরুরীভাবে আনার তাগাদা দিয়ে এসেছিল।

সেদিন সুজিতের দেখা পায়নি প্রতাপ। তাই আবার একদিন গেল দেখা করতে।

প্রতাপ আসতেই সুজিত মহা আড়ম্বরে তাকে অভ্যর্থনা করলে—এসো, এসো,—দেশের প্রকৃত সেবক এবং নেতা—দেশের প্রকৃত নিয়ামক—আর কি বলবার বলোতো—

প্রতাপ হেসে বললে—সব বাজে।

—বাজে মানে?

—মানে তুমি আমাকে এত বিশেষণ দিচ্ছ যে মাথা ঘুরে না পড়ে যাই। ঢের হয়েছে, থামো ভাই।

—দুজনেই হেসে উঠল। তারপর চেয়ার টেনে বসল

—দেখছো ত?

—কিন্তু কেন?

—তোমার কি মনে হয়?

—মনে হওয়া নয়—তোমাকে কোলকাতায় যেতে হবে, সেখানে থাকতে হবে। এখানে থাকা চলবে না।

—কেন?

—আরে রাম—এমন জায়গায় মানুষ থাকে? এই অধঃপতিত গ্রামে, এই সব সেকালে লোকদের মধ্যে—ছিঃ ছিঃ—

প্রতাপ হাসল।

—হাসছো যে? আমি কিছু ভুল বলেছি? এসব ভাই আমি বরদাস্ত করতে পারব না—কিছুতেই না। এই সব তথাকথিত সমাজ —আর তার নাম বুজরুকি—উঃ অসহ্য।

প্রতাপ বললে—ধীরে বন্ধু ধীরে। এক কথায় মাথা গরম করলে কি চলে!

—গরম হবে না?

—না।

—কেমন করে ওদের সহ্য করি বল?

—আরে ভাই, এই সব পাকা মাথা কটা লোক—তারা আর কদিন আছে বলো? আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ওদের দিন প্রায় শেষ। তারপর? তারপর সমাজটার ভার নেবে কারা? এই তুমি আমি বা আমাদের দল। তাই নয়?

অসহিষ্ণুভাবে সুজিত বললে—অত সোজা নয় ভাই—

—কেন?

—এই সব বুড়োর অন্ততঃ দশ পনর বছর ধরে বাঁচবে। এতদিন সমাজটা এমনি থাকবে, আর আমরা থাকবো তা সহ্য করতে? না ভাই এমন অন্যায় অত্যাচার সহ্য করা উচিত নয়। দরকার হয় পাকা মাথা কাটাকে বরং গুন করা উচিত—

প্রতাপ আবার হাসল

বললে—তুমি ভাই সদ্য বিলেত ফেরৎ মানুষ। তোমার রক্ত বড় গরম। তাই তুমি আমি যা যা প্রত্যক্ষ করেছি তার দু একটা তোমায় বললে তোমার মাথা খারাপ হবে।

—কি রকম?

—শোন, নারীদের অর্থাৎ কিশোরী বা যুবতী নারীদের এই বৃদ্ধ সমাজ পতিতা সমাজচ্যুত করে কেন জান?

—কেন ?

—এই লোমচর্ম বৃদ্ধেরাই অনেকে পারে তাদের ভোগ করে।

—সর্বনাশ।

—হ্যাঁ শুনবে ? তোমাদেরই পরিচিত এ অতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের কথা ?

সুজিত বললে—আমি ত এদেশের কাউকে বেশি চিনি না ভাই।

—কিন্তু তাঁকে চেন !

—কে সে ?

—তোমাদেরই কুল পুরোহিত ন্যায়রত্ন মশাই।

—তিনি কি করেছিলেন ?

—দিন পনোরো আগেও আমি কৈঞ্চ পাড়ায় একটা রোগীর সেবা করে ফেরার পথে দেখলাম জেলে পাড়ার একটা ঘর থেকে তিনি রাতের আঁধারে লুকিয়ে বের হলেন। সে মেয়েটি সমাজচ্যুতা ! যদি আমি সবাইকে এ কথা বলি, আমি মিথ্যা বদনাম দিচ্ছি বলে হয়ত আমাকে গ্রাম ত্যাগ করতে হবে।

সুজিত বললে—জানি। সেদিন মা আমাকে বলেছিলেন তাঁকে প্রণাম করতে। তিনি তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। আমি প্রণাম না করে কপালে হাত ঠেকালাম। তাই তিনি আমায় পছন্দ করেননি বলে মনে হলো।

বলে সে হাসল।

প্রতাপ বললে—বিমল মিত্রের বিধবা যুবতী মেয়েকে অন্য অঞ্চলের বিধর্মী গুণ্ডারা আক্রমণ করলে। সে চীৎকার করল, কিন্তু কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এলোনা।

অনেক কষ্টে মেয়েটা ওদের হাত থেকে পালিয়ে গ্রামে ফিরল—কিন্তু সমাজে তার স্থান হলো না।

—তারপর ?

—তখন সে থাকে এই জেলে পাড়ার প্রান্তে। ভাল ভাবেই তার দিন চলে।

—আশ্চর্য!

—আর তা চালাতে সাহায্য করে গোপনে আমাদের দু একজন সমাজ পতি।

—উঃ, এদের চাবকে দিতে হয় প্রতাপ—আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি ওদের চাবকাবো—

কিন্তু আমি তবু কাজ করছি নতুন এক আদর্শের মুখ চেয়ে।

* * *

কিরণময়ী ছেলের পড়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

প্রতাপকে পাওয়াই মুস্কিল।

দুদিন সে এখানে ছিল না—সুজিতের সঙ্গে সে গেছিল কোলকাতা কাল রাতে যখন ফিরেছে তা কিরণময়ী জানেন না!

পড়ার ঘরের বাড়টার কাছে থাকে—তাই সে ফিরে এসে সেখানে রাতে শুয়েছিল।

তখনও সে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল।

ভেজানো দরজা ধীরে ধীরে খুলে কিরণময়ী দরজার উপরে দাঁড়ালেন। প্রতাপ ঘুমোছিল জানতে পারেনি।

ঘুমন্ত অবস্থায় মা দেখলেন—সে বড় রোগা হয়ে গেছে। কত দুঃখ বেদনা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তা নিজের জন্যে নয় সব পরের জন্যে। সে এম এ তে ফার্ষ্ট ক্লাসফার্ষ্ট হয়েছিল—যে কোন চাকরীর অভাব তার হতো না। কিন্তু সে চাকরী করলে না। পুত্রগর্বে মায়ের বুকটা ভরে ওঠে। তাঁর পুত্রের মত পুত্র কজনের হয় নিজে সে বিরাট শিক্ষিত—পিতৃ পুরুষেরও অর্থের অভাব নাই। তবু সে কোনও দিন নিজের দিকে তাকায় না—পরের জন্য সে আজ কত পরিশ্রম করে—কত তার চিন্তা।

সে কখনো চায় না কোলকাতায় থাকতে। কিরণময়ী তা কতবার বলেছেন—সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। মাতৃভূমির উন্নতি তার একান্ত কাম্য। কিরণময়ী তাতে বাধা দিতে পারেননি।

আজ তাঁর মনে হলো—আর নয়। এবার তিনি ছেলে ও পুত্রবধূ নিয়ে কোলকাতায় গিয়ে বাস করবেন।

—মা! ঘুম ভাঙতেই প্রতাপ বললে—তুমি কখন এলে মা?

—এই মাত্র এসেছি। মঞ্জুর কাছে শুনলাম তুই রাতে ফিরেছিস। কিন্তু কাউকে ত ডাকিসনি। সারারাত ঘরের একটা চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়েছিস্। রাতে কিছু খাওয়াও বোধহয় হয়নি।

—না মা খেয়েছি।

—কোথায়?

—সুজিতের মা আমাকে অনেক খাইয়ে দিয়েছে। না খেয়ে এলে অন্ততপক্ষে তোমায় নিশ্চয়ই ডাকতাম। আর এই ইজিচেয়ারে বেশ আরামেই ঘুমিয়েছি। তুমি না এলে হয়তো আরও ঘুমোতাম।

—যাই হোক বাবা, এবার আমরা সবাই কোলকাতা গিয়ে থাকব। আমাদের আর এখানে ভাল লাগছে না।

—সেকি মা!

—হ্যাঁ, আমি কোলকাতায় যাব—

—কেন?

—তোর শরীর দিনরাত খেটে খেটে কি হচ্ছে বল তো। পরের জন্যে এ খাটা। কি লাভ তাতে। আরও উল্টে বদনাম শুনতে হয়।

—সেখানে কি করব।

—চাকরী করবি।

—কেন টাকার ত আমাদের অভাব নেই মা।

—তা হোক, বেশ সময় কাটবে—আর অনর্থক তোর এই পরিশ্রম আমার ভালো লাগছে না।

—না মা, আমরা ত এখানে ভালই আছি। তুমি যে কি চোখ দিয়ে আমায় দেখো! কেউ ত বলে না আমার শরীর খারাপ হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি কি সত্যিই কোল্‌কাতায় যেতে চাও মা!

—তুই কি তা চাস না?

—না।

—বেশ, তবে যা পারিস কর।

—আমার পিতৃপুরুষের ভিটেয় থাকা আর দেশের সেবা এর চেয়ে বড় ধর্ম আর কি হতে পারে মা? তুমি যদি বলো তবে না হয় কোলকাতায় যাব। চাকরীর দরখাস্ত দিচ্ছি?

—না থাক। তোর এত বড় আদর্শকে আমি যা হয়ে যেমন করে নষ্ট করি? আচ্ছা চলি, এদিকে চামেলী হয়ত আবার চা আর খাবার দিয়ে বসে আছে!

প্রতাপ মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় নিলে। তিনি ভেতরের দিকে গেলেন।

প্রতাপের মন সত্যিই বড় খুশি হলো।

সে ভেবেছিল মা হয়তো তাকে কোলকাতা যাবার জন্যে চাপ দেবেন।

কিন্তু সে তা মনে প্রাণে চায় না। প্রতাপ ভেবেছিল মা বোধ হয় চান যে তারা কোলকাতা যায়—কিন্তু এখন দেখল তা ভুল। ছেলের জন্যে মা যদিও মনে মনে কোলকাতার কথা ভাবেন, কিন্তু মনে প্রাণে তিনি এই পৈতৃক বাড়ি ত্যাগ করে যেতে চান না।

আর সে যে গ্রামের সকলের সেবা করে, সকলের আশীর্বাদ পায়, এতে মাও খুব খুশী হল—তবে তা হয়ত মুখে স্বীকার করেন না।

কিন্তু চামেলী কি চায়?

প্রতাপ বুঝতে পেরেছে চামেলী কি চায়—কিন্তু সে মুখে কিছু বলে না।

তবে এটা তার স্থির নিশ্চিত ধারণা যে চামেলীও নিশ্চয় চায় গ্রামে থাকতে।

সেও চায় গ্রামের সেবা করতে—দেশের ডাকে সাড়া দিতে।

তাই চামেলীকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে প্রতাপ। তার গভীর ভালবাসা যে এই শ্রদ্ধা থেকেই উদ্ভূত তাও সে বেশ বুঝতে পারে। তাই ত গ্রাম সে ছাড়তে পারে না।

কিরণময়া বেরিয়ে যাবার একটু পরেই চা আর খাবার হাতে ঢুকল চামেলী।

চা পান শেষ করে চামেলীর দিকে চেয়ে প্রতাপ বললে—তোমার অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষার ফলে লখিয়ার মা আবার বেঁচে উঠল। নইলে বেচারা নকুল সর্দারকে এই শেষ বয়সে বোধ হয় পথে দাঁড়াতে হতো।

স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়ে চামেলী বলে উঠল—অত করে আর আমায় বাড়িয়ো না গো। এতে যে মন অসৎ হয়ে আসে। বরং ভেবে দেখ, তুমি যদি আমায় পায়ে স্থান না দিতে, তা হলে আমার স্থান আজ কোথায় হতো।

—তোমার স্থান যেখানে হওয়া উচিত। তোমার আমার অজ্ঞাতে ভগবান আগে থেকেই যে নীড় বেঁধে রেখেছেন চামেলী! তোমার স্থান চিরদিনই আমার পাশে। আজ মহা আনন্দের এই চরম মুহূর্তে সেই দয়াময় ভগবানের উদ্দেশ্যে আমরা যুক্ত করে প্রণাম জানাই।

একটু থেমে আবার বললে—

তিনি যেন আমাদের কণ্টকাকীর্ণ যাত্রাপথ সহজ, সুগম করে দেন। আমরা যেন সুন্দর প্রেম-নিকেতনে পৌঁছাবার গতিপথে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই....

আভূমিপ্রণত হয়ে তারা প্রার্থনা নিবেদন করে নেয়।

তারপর উঠে বসল ওরা।

এমন সময় কিরণময়ী ভেতরে এলেন।

—মা! প্রতাপ বললে—

—বাবা, দেখ তো কারা যেন বাইরে এসেছে?

—আমাকে খুঁজছে?

—হ্যাঁ বাবা।

প্রতাপ বাইরে এলো ধীর পায়ে।

তার পেছনে পেছনে এলো চামেলী—সবার পেছনে কিরণময়ী।

প্রতাপ দেখল প্রাঙ্গণে গ্রামের তরুণ দল এসে জরো হয়েছে।

একজন বললে—বর্ধমানে ভয়াবহ প্লাবন হয়েছে দাদা। আজ আমাদের সেবাদল যাত্রা করতে চায়।

—বেশ ত ভাই।

—আপনি যাবেন ত আমাদের নেতৃত্ব নিয়ে?

—হ্যাঁ যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।

—জয় ভারতমাতা কী জয়—

আনন্দে ধ্বনি তুলে তরুণ দল বিদায় নিলে।

তারা বেরিয়ে গেলে চামেলীর দিকে চেয়ে প্রতাপ বললে—দেখলে ত চামেলি, যাঁর কাজ তিনিই করান, আমরা কেবল নিমিত্তের ভাগী। মায়ের ডাকের সঙ্গে দেশের ডাক—আমি এবার তাহলে তৈরী হই।

চামেলী বললে—তুমি একা? না, চল, আমিও তোমার সঙ্গে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি—আমাকেও যেতে হবে তোমার সঙ্গে।

—